প্রবন্ধ

স্বদেশ ও সাহিত্য

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
2021

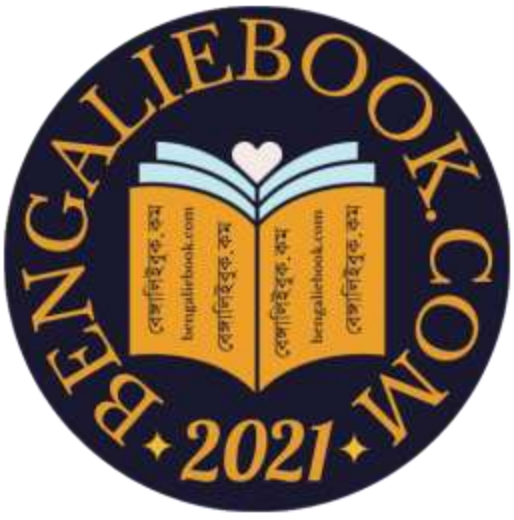

সূচিপত্র

- প্রকাশকের কথা 3
- স্বদেশ 7
- স্বরাজ সাধনায় নারী 15
- শিক্ষার বিরোধ 23
- স্মৃতিকথা 41
- অভিনন্দন 55
- সাহিত্য 58
- গুরু-শিষ্য সংবাদ 59
- সাহিত্য ও নীতি 62
- সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি 70
- ভারতীয় উচ্চ-সঙ্গীত 79
- আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ত 86
- সাহিত্যের রীতি ও নীতি 93
- অভিভাষণ 108
- অভিভাষণ 113
- যতীন্দ্র-সম্বর্ধনা 117
- শেষ প্রশ্ন 121

- রবীন্দ্রনাথ 126

প্রকাশকের কথা

বাঙ্গল সাহিত্যের এ অমূল্য রত্ন কয়টি পুরাতন সাময়িক পত্রাদির গর্ভে সমাধিস্থ ছিল। এ গুলি উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হয়। ভয়ে ভয়ে এক দিন পূজ্যপাদ শরৎচন্দ্রের নিকট আমার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া অনুমতি প্রার্থনা করি এবং তিনিও সানন্দে তাহা দান করেন।

আজ সেগুলি বাঙ্গলার সুধী-সমাজের হাতে অর্পণ করিতে যাইয়া আনন্দও হইতেছে, ভয়ও হইতেছে। যোগ্যতর লোক প্রকাশের ভার গ্রহণ করিলে হয়ত এ রত্নগুলির মর্য্যাদা রক্ষা হইত, সঙ্গত হইত, শোভনও হইত। তাহারা যাহা পারিতেন আমি হয়ত যোগ্যতা ও সঙ্গতির অভাবে তাহা পারি নাই, তথাপি আমার আশা এই যে, শরৎচন্দ্রের লেখনী যে রচনা প্রসব করিয়াছে, তাহা নিজের গৌরবে নিজেই গৌরবান্বিত, নিজের প্রভায় নিজেই উজ্জ্বল। যোগ্যতা থাকিলে প্রবন্ধগুলির বাহিরের সৌন্দর্য্য বাড়িতে পারিত বটে কিন্তু আমার অযোগ্যতায়ও বোধকরি ইহাদের ভিতরের সৌন্দর্য্য কমে নাই,– কমিতে পারেও না।

কিছু দিন আগে অপর দুইটি মূল্যবান রচনা এই সম্পূর্ণ সঙ্কলনগ্রন্থ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া "তরুণের বিদ্রোহ" নামে প্রকাশ করিতে হইয়াছে। নিতান্ত বাধ্য হইয়াই তা' করিয়াছিলাম, কেন করিয়াছিলাম তা' বলিবার দিন আজও আসে নাই, যদি কখনো সে দিন আসে বলিব,– এ ত্রুটি সংশোধনও সেদিনই হইবে। এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য পাঠক সমাজের কাছে আজ শুধু মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহিতেছি।

যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সমস্ত প্রবন্ধ হয়ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই,–যদি কেহ দয়া করিয়া প্রকাশ-যোগ্য অপর কোন প্ররন্ধের সন্ধান দেন, দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা সংযোগ করিয়া দিব। কতকগুলি অসমাপ্ত রচনা পরিত্যাগ করা উচিত মনে করিয়া তাহাই

করিয়াছি। এ ছাড়াও কয়েকটি প্রবন্ধ অনিবার্য্য কারণে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। কয়েকটি বক্তৃতা, যাহা সাময়িক পত্রাদিতেও প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও সংযোগ করি নাই। কারণ, যাঁহারা অনুলিপি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা শরৎচন্দ্রের স্বভাবসিদ্ধ ভাষার সম্মোহিনী-শক্তি বজায় রাখিতে পারেন নাই। ভাব শরৎচন্দ্রের হইলেও ভাষা কৃত্তিম। ভাষার যাদুকর শরৎচন্দ্রের স্বন্ধে সে দুষ্কৃতির ভার চাপাইতে প্রবৃত্তি হইল না।

যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও কয়েকটি ভুল রহিয়াই গিয়াছে। 'ছাপাখানার ভূত'এর দৌরাত্ম্য শারীরিক অসুস্থতা, সময়ের অভাব প্রভৃতি অজুহাত দেখাইয়া আমি তাহার দায়িত্ব এড়াইতে চাই না। সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমি নিজের অপারগতার জন্য পাঠকবৃন্দের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। একটা মারাত্মক ভূলের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজম। মুন্সীগঞ্জে পঠিত অভিভাষণটি "সাহিত্যে আর্ট ও দুনীতি" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্র ইহা অভিভাষণ হিসাবে পড়িয়াছিলেন, প্রবন্ধ হিসাবে নহে এবং ইহার কোন বিশেষ নাম দেওয়ারও তাহার অভিপ্রায় ছিল না। কোন মাসিক পত্রে উক্ত নামে অভিভাষণটি প্রকাশিত হওয়ায় অসাবধানত বশতঃ এ ক্ষেত্রেও তাঁহাই ছাপা হইয়া গিয়াছে। এই লজ্জাকর ভুলের জন্য আমি পূজ্যপাদ শরৎচন্দ্র ও পাঠক সমাজের নিকট অপরাধী।

মোট যে কয়টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল তাহার কয়েকটি সম্বন্ধে দু'চারিটি কথা বলা দরকার–

পূজ্যপাদ কবি রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপ প্রত্যাগমনের পর ১৩২৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় "শিক্ষার মিলন" শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন! "শিক্ষার বিরোধ' সে প্রবন্ধটির প্রতিবাদ। পরে 'শিক্ষার মিলন' সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত আকারে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 'শিক্ষার বিরোধে' যে সকল প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে, তাহা উক্ত পুস্তিকায় সন্ধান করিলে পাঠক নিরাশ হইবেন। সকল কথার সামঞ্জস্য খুঁজিতে হইলে মূল প্রবন্ধটি পড়া দরকার।

স্বর্গীয় দেশবন্ধুর কারামুক্তির পর মির্জ্জাপুর পার্কে (বর্ত্তমান শ্রদ্ধানন্দ পার্ক) দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে যে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়, তাহা শরৎচন্দ্রের রচনা। অভিনন্দন রচনায় প্রাণ ও নৈপুণ্যের প্রসঙ্গ বাদ দিলেও অন্যের একটি বিশেষত্বের জন্য ইহা চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য। পূর্ব্বে অভিনন্দন-পত্র রচনার যে সাধারণ রীতি প্রচলিত ছিল, ইহা তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত ত বটেই উপরন্তু বর্ত্তমান যুগের অভিনন্দন-পত্র রচনা-রীতির উপর ইহারই প্রভাব লক্ষিত হয়।

"আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ" "সাহিত্য ও নীতি," "সাহিত্যে আট ও দূর্নীতি" এবং প্রসঙ্গ ক্রমে ৫৪তম বাৎসরিক জন্মতিথিতে, "বঙ্কিম-শরৎ সমিতির অভিনন্দনের উত্তরে, প্রেসিডেন্সি কলেজে পঠিত অভিভাষণে" ও অন্যান্য প্রবন্ধে একই বিষয়ের অবতারণা দেখা যায়। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জনকয়েক শুচিবায়ুগ্রস্ত সমালোচকের কৃপায় আধুনিক সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে একটা তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে বিশেষভাবে শরৎ-সাহিত্যের প্রতিই সকলে "দুই হাত পুরিয়া বিদ্বেষের আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিতে থাকেন।" উপরোক্ত প্রবন্ধগুলি তাহার প্রতিবাদে সে সময়েরই রচনা। সব ক'টি প্রবন্ধ ও অভিভাষণেই তিনি সাধারণতঃ তাঁহার সাহিত্য রচনার আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করেন, বোধকরি এ জন্যই তাঁহাকে বিভিন্ন স্থানে বারবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করিতে হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি পড়িবার সময় কাল ও পরিস্থিতি বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

"সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি" প্রবন্ধটি পড়িবার পূর্ব্বে ১৩৩৪ শ্রাবণ সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের "সাহিত্য ধর্ম্ম" ও তাহার প্রতিবাদে এবং ভাদ্র সংখ্যায় শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'সাহিত্য ধর্ম্মের সীমানা' শীর্ষক প্রবন্ধ দুইটি পড়িলে ভাল হয়।

পরিশেষে আর একটি কথা না বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতে পারিতেছি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার শক্তি অল্প, যোগ্যতা আরও অল্প। সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব

ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ রায়, সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থালয় ও চৈতন্য লাইব্রেরীর সহায়তা না পাইলে সমস্ত প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করা আমাদ্বারা কতদূর সম্ভব হইত ঠিক বলিতে পারি না। বিশেষ ভাবে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য স্বেচ্ছায় এবং অক্লান্তভাবে প্রবন্ধ সংগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত সকল কাজে আন্তরিকভাবে সাহায্য না করিলে আমাদ্ধারা এ কাজ সম্পূর্ণ অসম্ভব হইত। শরৎচন্দ্রের চল্লিশ বছর বয়সের দুপ্রাপ্য ছবিখানিও তাঁহারই নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। 'বিচিত্রা' সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম পৃষ্ঠার সুদৃশ্য ব্লকটি ছাপিতে দিয়া বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন। মৌখিক ধন্যবাদ দিয়া আমি ইহাদের দানের অমর্য্যাদা করিতে চাই না। পুস্তকখানার সহিত চিরকাল ইহাদের সহৃদয়তার কথা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিব।

নিবেদক–
শ্রদীনেশচন্দ্র বর্ম্মণ।
৩১শে ভাদ্র, ১৩৩৯

স্বদেশ

আমার কথা

হাবড়া জেলা কংগ্রেস-কমিটির আমি ছিলাম সভাপতি। আমি ও আমার সহকারী বা সহকর্মী যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সকলেই পদত্যাগ করেছেন। এই কথাটা জানাবার জন্যেই আজকের এই সভার আয়োজন। নইলে সাড়ম্বরে বক্তৃতা শোনাবার জন্যে আপনাদের আহ্বান করে আনিনি। ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসভার এই ক্ষুদ্র শাখার যে কর্মভার আমার প্রতি ন্যস্ত ছিল তা থেকে বিদায় নেবার কালে আপনাদের কাছেই মুক্তকণ্ঠে তার হেতু প্রকাশ করাই এই সভার উদ্দেশ্য। একটা কথা উঠেছিল, চুপি চুপি সরে গেলেই ত হতো; এই লজ্জাকর ঘটনা এমন ঘটা করে জানাবার কি প্রয়োজন ছিল? আমার মনে হয় প্রয়োজন ছিল, মনে হয় নিঃশব্দে চুপি চুপি সরে গেলে চক্ষুলজ্জাটা বাঁচত, কিন্তু তাতে সত্যকার লজ্জা চতুর্গুণ হয়ে উঠত। এর পরে এ জেলায় কংগ্রেস কমিটি থাকবে কি থাকবে না, আমি জানিনে। থাকতে পারে, না থাকাও বিচিত্র নয়; কিন্তু সে যাই হোক ভেতরে যার ক্ষত, বাইরে তাকে অক্ষত দেখানোর পাপ আমি করতে চাইনে। এ একটা policy হতে পারে, কিন্তু ভাল policy বলে কোন মতেই ভাবতে পারিনে।

আমি কর্মী নই, এ গুরুভারের যোগ্য আমি ছিলাম না। অক্ষমতার ক্ষোভ আমার মনের মধ্যে আছেই, কিন্তু যে ভার একদিন গ্রহণ করেছিলাম, আজ তাকে অকারণে বা নিছক স্বার্থের দায়ে ত্যাগ করে যাচ্ছি, যাবার সময় এ কলঙ্কও আমার প্রাপ্য নয়। আমার এই কথাটাই আজ আপনাদের একটু ধৈর্য ধরে শুনতে হবে।

আমার মনের মধ্যে হয়ত রূঢ় কথা কোথাও একটু থেকে যেতে পারে, হয়ত আমার অভিযোগের মধ্যে অপ্রিয় সুরও আপনাদের কানে বাজবে, কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থায় যা সত্য বলে জেনেছি বা বুঝেছি, আপনাদের গোচর না করে আজ আমার ছুটি হতেই পারে না। কারণ, সত্য গোপন করা আত্মবঞ্চনারই সমান। এক আশঙ্কা প্রতিপক্ষের

উপহাস ও বিদ্রূপ। কিন্তু নিজের কর্মফলে তাই যদি অর্জন করে থাকি, আমি ছাড়া সে আর কে নেবে? আর তা যদি না হয়ে থাকে, বিদ্রূপের হেতু যদি সত্যই না ঘটে থাকে ত ভয় কিসের? যথার্থ সম্মানের বস্তুকে যে মূঢ় অযথা ব্যঙ্গ করে, সমস্ত লজ্জা ত তারই। অতএব, এ-সকল মিথ্যা দুশ্চিন্তা আমার নেই। আমার একমাত্র চিন্তা অকপটে আপনাদের কাছে সমস্ত ব্যক্ত করা। কারণ, প্রতিকারের ইচ্ছা ও শক্তি আপনাদেরই হাতে। এই শেষ মুহূর্তেও যদি একে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে চান, সে শুধু আপনারাই পারেন।

পাঞ্জাব অত্যাচার উপলক্ষে বছর-দেড়েক পূর্বে একদিন যখন দেশব্যাপী আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠেছিল, তখন আমরা আকাশজোড়া চীৎকারে চেয়েছিলাম স্বরাজ। মহাত্মাজীর জয় জয়কার। গলা ফাটিয়ে দিগ্বিদিকে প্রচার করে বলেছিলাম, স্বরাজ চাই-ই চাই। স্বাধীনতায় মানুষের জন্মগত অধিকার। এবং স্বরাজ ব্যতিরেকে কোন অন্যায়েরই কোন দিন প্রতিবিধান হতে পারবে না। কথাটা যে মূলতঃ সত্য, এ বোধ করি কেহই অস্বীকার করতে পারে না। বাস্তবিকই স্বাধীনতায় মানবের জন্মগত অধিকার, ভারতবর্ষের শাসনভার ভারতবর্ষীয়দের হাতেই থাকা চাই এবং এ দায়িত্ব থেকে যে-কেউ তাদের বঞ্চিত করে রাখে, সেই অন্যায়কারী। এ সবই সত্য। কিন্তু এমনি আরও ত একটা কথা আছে, যাকে স্বীকার না করে পথ নেই,—সে হচ্ছে আমাদের কর্তব্য।

Right এবং Duty এই দুটো অনুপূরক শব্দ ত সমস্ত আইনের গোড়ার কথা। সকল দেশের সকল সামাজিক বিধানে একটা ছাড়া যে আর একটা একমুহূর্তও দাঁড়াতে পারে না, এ তো অবিসম্বাদী সত্য। কেবল আমাদের দেশেই কি এই বিশ্বনিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে? স্বরাজ বা স্বাধীনতা যদি আমাদের জন্মস্বত্ব হয়, ঠিক ততখানি কর্তব্যের দায় নিয়েও ত আমরা মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছি। একটাকে এড়িয়ে আর একটা পাব এত বড় অন্যায়, অসঙ্গত দাবী,—এত বড় পাগলামি আর ত কিছু হতেই পারে না। ঘটনাক্রমে কেবলমাত্র ভারতবর্ষীয় হয়ে জন্মেছি বলেই ভারতের স্বাধীনতার অধিকার উচ্চকণ্ঠে দাবী করাও কোন মতেই সত্য হতে পারে না! এবং এ প্রার্থনা ইংরাজ কেন, স্বয়ং বিধাতাপুরুষও বোধ করি মঞ্জুর করতে পারেন না। এই সত্য, এই সনাতন বিধি, এই

চিরনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা হৃদয় দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করার দিন আজ আমাদের এসেছে। একে ফাঁকি দিয়ে স্বাধীনতার অধিকার শুধু আমরা কেন, পৃথিবীতে কেউ কখনো পায়নি, পায় না এবং আমার বিশ্বাস, কোনদিন কখনো কেউ পেতেও পারে না। কর্তব্যহীন অধিকারও অনধিকারের সমান। কাজ করব না, মূল্য দেবো না অথচ পাবো, প্রার্থনার এই অদ্ভুত ধারাই যদি আমরা গ্রহণ করে থাকি, তা হলে নিশ্চয়ই বলছি আমি, কেবলমাত্র সমস্বরে ও প্রবলকণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ও মহাত্মার জয়ধ্বনিতে গলা চিরে আমাদের রক্তই বার হবে, পরাধীনতার জগদ্দল শিলা তাতে সূচ্যগ্র ভূমিও নড়ে বসবে না।

একটুখানি অবিনয়ের অপবাদ নিয়েও বলতে হচ্ছে, বুড়ো হলেও চিরদিনের অভ্যাসে এ চোখের দৃষ্টি আমার আজও একেবারে ঝাপসা হয়ে যায়নি। যা যা দেখছি, (অন্ততঃ এই হাবড়া জেলায় যা দেখেছি) তা নিছক এই ভিক্ষার চাওয়া, দাম না দিয়ে চাওয়া, ফাঁকি দিয়ে চাওয়া। মানুষের কাজ-কর্ম, লোক-লৌকিকতা, আহার-বিহার, আমোদ-আহ্লাদ, সর্বপ্রকারের সুখ-সুবিধের কোথাও যেন কোন ত্রুটি না ঘটে, পান থেকে একবিন্দু চুন পর্যন্ত যেন না খসতে পায়,—তার পরে স্বরাজ বল, স্বাধীনতা বল, চরকা বল, খদ্দর বল, মায় ইংরাজকে ভারত সমুদ্র উত্তীর্ণ করে দিয়ে আসা পর্যন্ত বল, যা হয় তা হোক, কোন আপত্তি নেই। আপত্তি তাদের না থাকতে পারে, কিন্তু ইংরাজের আছে। শতকরা পঁচানব্বই জন লোকের এই হাস্যাস্পদ চাওয়াটাকে সে যদি হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলে ভারতবাসী স্বরাজ চায় না,—সে কি এত বড়ই মিথ্যা কথা বলে? যে ইংরাজ পৃথিবীব্যাপী রাজত্ব বিস্তার করেছে, দেশের জন্য প্রাণ দিতে যে এক নিমেষ দ্বিধা করে না, যে স্বাধীনতার স্বরূপ জানে, এবং পরাধীনতার লোহার শিকল মজবুত করে তৈরি করবার কৌশল যার চেয়ে বেশি কেউ জানে না,—তাকে কি কেবল ফাঁকি দিয়ে, চোখ রাঙ্গিয়ে, গলায় এবং কলমে গালিগালাজ করে, তার ত্রুটি ও বিচ্যুতির অজস্র প্রমাণ ছাপার অক্ষরে সংগ্রহ করে, তাকে লজ্জা দিয়েই এত বড় বস্তু পাওয়া যাবে? এ প্রশ্ন ত সকল তর্কের অতীত করে প্রমাণিত হয়ে গেছে, এই লজ্জাকর বাক্যের সাধনায় কেবল লজ্জাই বেড়ে উঠবে, সিদ্ধিলাভ কদাচ ঘটবে না।

আত্মবঞ্চনা অনেক করা গেছে, আর তাতে উদ্যম নেই। জড়ের মত নিশ্চল হয়ে জন্মগত অধিকারের দাবী জানাতেও আর যেমন আমার স্বর ফোটে না, পরের মুখেও তত্ত্বকথা শোনবার ধৈর্য আর আমার নেই। আমি নিশ্চয় জানি, স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার যদি কারও থাকে, তা সে মনুষ্যত্বের, মানুষের নয়। অন্ধকারের মাঝে আলোকের জন্মগত অধিকার আছে দীপ-শিখার, দীপের নয়; নিবানো প্রদীপের এই দাবী তুলে হাঙ্গামা করতে যাওয়া শুধু অনর্থক নয়, অপরাধ,—সকল দাবী-দাওয়া উত্থাপনের আগে এ কথা ভুলে গেলে কেবল ইংরাজ নয়, পৃথিবীসুদ্ধ লোক আমোদ অনুভব করবে।

মহাত্মাজী আজ কারাগারে। তাঁর কারাবাসের প্রথম দিনে মারামারি কাটাকাটি বেধে গেল না, সমস্ত ভারতবর্ষ স্তব্ধ হয়ে রইল। দেশের লোকে সগর্বে বললে, এ শুধু মহাত্মাজীর শিক্ষার ফল। Anglo-Indian কাগজওয়ালারা হেসে জবাব দিলে, এ শুধু নিছক Indifference। আমার কিন্তু এ বিবাদে কোন পক্ষকেই প্রতিবাদ করতে মন সরে না। মনে হয়, যদি হয়েও থাকে ত দেশের লোকের এতে গর্বের বস্তু কি আছে? Organised violence করবার আমাদের শক্তি নেই, প্রবৃত্তি নেই, সুযোগ নেই। আর হঠাৎ violence? সে ত কেবল একটা আকস্মিকতার ফল। এই যে আমরা এতগুলি ভদ্রব্যক্তি একত্র হয়েছি, উপদ্রব করা আমাদের কারও ব্যবসা নয়, ইচ্ছাও নয়, অথচ এ কথাও ত কেউ জোর করে বলতে পারেনি আমাদের বাড়ি ফেরবার পথটুকুর মাঝেই, হঠাৎ কিছু-একটা বাধিয়ে না দিতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে একটা মস্ত ফ্যাসাদ বেধে যাওয়াও ত অসম্ভব নয়। বাধেনি সে ভালই, এবং আমিও একেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে চাইনে, কিন্তু এ নিয়ে দাপাদাপি করে বেড়ানোরও হেতু নাই। একেই মস্ত কৃতিত্ব বলে সান্ত্বনা লাভ করতে যাওয়া আত্মপ্রবঞ্চনা। আর Indifference? এ কথায় যদি কেউ এই ইঙ্গিত করে থাকে যে, মহাত্মার কারারোধে দেশের লোকের গভীর ব্যথা বাজেনি, ত তার বড় মিছে কথা আর হতেই পারে না। ব্যথা আমাদের মর্মান্তিক হয়েই বেজেছে; কিন্তু তাকে নিঃশব্দে সহ্য করাই আমাদের স্বভাব, প্রতিকারের কল্পনা আমাদের মনেই আসে না।

প্রিয়তম পরমাত্মীয় কাউকে যমে নিলে শোকার্ত মন যেমন উপায়হীন বেদনায় কাঁদতে থাকে, অথচ, যা অবশ্যম্ভাবী তার বিরুদ্ধে হাত নেই, এই বলে মনকে বুঝিয়ে আবার খাওয়া-পরা, আমোদ-আহ্লাদ, হাসি-তামাশা, কাজ-কর্ম যথারীতি পূর্বের মতই চলতে থাকে, মহাত্মার সম্বন্ধেও দেশের লোকের মনোভাব প্রায় তেমনি। তাদের রাগ গিয়ে পড়ল জজসাহেবের উপর। কেউ বললে তার প্রশংসাবাক্য কেবল ভণ্ডামি, কেউ বললে তার দু'বছর জেল দেওয়া উচিত ছিল, কেউ বললে বড় জোর তিন বছর, কেউ বললে না চার বছর, কিন্তু ছ'বছর জেল যখন হল তখন আর উপায় কি? এখন গবর্নমেন্ট যদি দয়া করে কিছু আগে ছাড়েন তবেই হয়। কিন্তু এই ভেবে তিনি জেলে যাননি। তাঁর একান্ত মনের আশা ছিল হোক না জেল ছ' বছর, হোক না জেল দশ বছর,—তাঁকে মুক্ত করা ত দেশের লোকেরই হাতে। যে দিন তারা চাইবে, তার একটা দিন বেশি কেউ তাকে জেলে ধরে রাখতে পারবে না, তা সে গবর্নমেন্ট যতই কেন না শক্তিশালী হউন। কিন্তু সে আশা তাঁর একলারই ছিল, দেশের লোকের সে ভরসা করবার সাহস হলো না।

তাদের অর্থোপার্জন থেকে শুরু করে আহার-নিদ্রা অব্যাহত চলতে লাগল, তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থে কোথাও এতটুকু বিঘ্ন হলো না, শুধু তিনি ও তাঁর পঁচিশ হাজার সহকর্মী দেশের কাজে দেশের জেলেই পচতে লাগলেন। প্রতিবিধান করবে কি, এতবড় হীনতায় লজ্জা বোধ করবার শক্তি পর্যন্ত যেন এদের চলে গেছে। এরা বুদ্ধিমান, বুদ্ধির বিড়ম্বনায় ছুতো তুলেছে Non-violence কি সম্ভব? Non-co-operation কি চলে? গান্ধীজীর movement কি practical? তাইত আমরা...। কিন্তু কে এদের বুঝিয়ে দেবে কোন movement-ই কিছু নয়, যে move করে সেই মানুষই সব। যে মানুষ, তার কাছে Co-operation, Non-co-operation, Violence, Non-violence সবই সমান, সবই সমান ফলপ্রসূ।

Non-co-operation বস্তুটা ভিক্ষে চাওয়া নয়, ও একটা কাজ, সুতরাং এ কথা কিছুতেই সত্য নয় যে, Non-co-operation পন্থা এ দেশে অচল,—মুক্তির পথ সে দিকে যায়নি। অন্ততঃ, এখনো একদল লোক আছে, তা সংখ্যায় যত অল্পই হোক, যারা সমস্ত অন্তর দিয়ে একে আজও বিশ্বাস করে। এরা কারা জানেন? একদিন যারা মহাত্মাজীর ব্যাকুল আহ্বানে স্বদেশ-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছিল, উকীল তার ওকালতি ছেড়ে, শিক্ষক তার শিক্ষকতা ছেড়ে, বিদ্যার্থী তার বিদ্যালয় ছেড়ে, চারিদিকে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল,

যাঁদের অধিকাংশই আজ কারাগারে,—এরা তাঁদেরই অবশিষ্টাংশ। দেশের কল্যাণে, আপনার কল্যাণে, আমার কল্যাণে, সমস্ত নরনারীর কল্যাণে যারা ব্যক্তিগত স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছিল, সেই দেশের লোক আজ তাদের কি দাঁড় করিয়েছে জানেন? আজ তারা সম্মানহীন, প্রতিষ্ঠাহীন, লাঞ্ছিত, পীড়িত, ভিক্ষুকের দল। তাদের জীর্ণ মলিন বাস, তারা গৃহহীন, তারা মুষ্টিভিক্ষায় জীবন যাপন করে, যৎসামান্য তেল নুনের পয়সার জন্য স্টেশনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে চাইতে বাধ্য হয়। অথচ স্বেচ্ছায় সে সমস্ত ত্যাগ করে এসেছে। যতটুকুতে তার প্রয়োজন, সেটুকু সমস্ত দেশের কাছে কতই-না অকিঞ্চিৎকর! এইটুকু সে সসম্মানে সংগ্রহ করতে পারে না। অথচ এরাই আজও অন্তরে স্বরাজের আসন এবং দেশের বাহিরে সমস্ত ভারতের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পতাকা বহন করে বেড়াচ্ছে। আশার প্রদীপ—তা সে যতই ক্ষীণ হোক আজও এদেরই হাতে। এদের নির্যাতনের কাহিনী সংবাদপত্রের পাতায় পাতায়, কিন্তু সে কতটুকু—যে অব্যক্ত লাঞ্ছনা ও অপমান এদের দেশের লোকের কাছে সহ্য করতে হয়! মহাত্মাজীর আন্দোলন থাক বা যাক এদের অশ্রদ্ধেয় করে আনবার, দীন হীন ব্যর্থ করে তোলবার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত দেশের লোককে একদিন করতেই হবে, যদি ন্যায় ও ধর্ম ও সত্যকার বিধিবিধান কোথাও কোনখানে থাকে। হাওড়া জেলার পক্ষ থেকে আজ যদি আমি মুক্তকণ্ঠে বলি অন্ততঃ এ জেলার লোক স্বরাজ চায় না, তার তীব্র প্রতিবাদ হবে। কাগজে কাগজে আমাকে অনেক কটূক্তি, অনেক গালাগালি শুনতে হবে। কিন্তু তবুও এ কথা সত্য। কেউ কিছু করব না; কোন ক্ষতি, কোন অসুবিধা, কোন সাহায্য কিছুই দেব না—আমার বাঁধাধরা সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রার একতিল বাহিরে যেতে পারব না,—আমার টাকার উপর টাকা, বাড়ির উপর বাড়ি, গাড়ির উপর গাড়ি, আমার দোতলার উপর তেতলা এবং তার উপর চৌতলা অবারিত এবং অব্যাহত উঠতে থাক—কেবল এই গোটাকতক বুদ্ধিভ্রষ্ট লক্ষ্মীছাড়া লোক না খেয়ে না দেয়ে, খালি গায়ে খালি পায়ে ঘুরে ঘুরে যদি স্বরাজ এনে দিতে পারে ত দিক, তখন না হয় তাকে ধীরে সুস্থে চোখ বুজে পরম আরামে রসগোল্লার মত চিবানো যাবে।

কিন্তু এমন কাণ্ড কোথাও কখনো হয় না। আসল কথা এরা বিশ্বাস করতেই পারে না, স্বরাজ নাকি আবার কখনও হতে পারে। তার জন্য আবার নাকি চেষ্টা করা যেতে পারে। কি হবে তাতে, কি হবে চরকায়, কি হবে দেশাত্মবোধের চর্চায়? নিবানো দীপ-

শিখার মত মনুষ্যত্ব ধুয়ে মুছে গেছে, একমাত্র হাত পেতে ভিক্ষের চেষ্টা ছাড়া কি হবে আর কিছুতে!

একটা নমুনা দিই :

সেদিন নারী কর্মমন্দির থেকে জন-দুই মহিলা ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়কে নিয়ে দুর্যোগের মধ্যেই আমতা অঞ্চলে বেরিয়ে পড়েছিলাম, ভাবলাম ঋষিতুল্য ও সর্বদেশপূজ্য ব্যক্তিটিকে সঙ্গে নেওয়ায় এ যাত্রা আমার সুযাত্রা হবে। হয়েও ছিল। বন্দেমাতরম্ ও মহাত্মার ও তাঁর নিজের প্রবল জয়ধ্বনির কোন অভাব ঘটেনি এবং ওই রোগা মানুষটিকে স্থানীয় রায়বাহাদুরের ভাঙ্গা তাঞ্জামের মধ্যে সবলে প্রবেশ করানোরও আন্তরিক ও একান্ত উদ্যম হয়েছিল। কিন্তু তার পরের ইতিহাস সংক্ষেপে এইরূপ—আমাদের যাতায়াতের ব্যয় হল টাকা পঞ্চাশ। ঝড়ে, জলে আমাদের তত্ত্বাবধান করে বেড়াতে পুলিশেরও খরচা হয়ে গেল বোধ হয় এমনি একটা কিছু। বর্ধিষ্ণু স্থান, উকীল মোক্তার ও বহু ধনশালী ব্যক্তির বাস, অতএব স্থানীয় তাঁত ও চরকার উন্নতিকল্পে চাঁদা প্রতিশ্রুত হল তিন টাকা পাঁচ আনা। তারপর আচার্যদেব বহু পরিশ্রমে আবিষ্কার করলেন জন-দুই উকীল বিলাতী কাপড় কেনেন না, এবং একজন তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করলেন, ভবিষ্যতে তিনি আর কিনবেন না। ফেরবার পথে প্রফুল্লচন্দ্র প্রফুল্ল হয়ে আমার কানে কানে বললেন, হাঁ, জেলাটা উন্নতিশীল বটে! আর একটু লেগে থাকুন, Civil Disobedience বোধ হয় আপনারাই declare করতে পারবেন।

আর জনসাধারণ? সে তো সর্বথা ভদ্রলোকেরই অনুগমন করে।

এ চিত্র দুঃখের চিত্র, বেদনার ইতিহাস, অন্ধকারের ছবি; কিন্তু এই কি শেষ কথা? এই অবস্থাই কি এ জেলার লোক নীরবে শিরোধার্য করে নেবে? কারও কোন কথা, কোন ত্যাগ, কোন কর্তব্যই কি দেখা দেবে না? যারা দেশের সেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছে, যারা কোন প্রতিকূল অবস্থাকেই স্বীকার করতে চায় না, যারা Government-এর কাছেও

পরাভব স্বীকার করেনি, তারা কি শেষে দেশের লোকের কাছেই হার মেনে ফিরে যাবে? আপনারা কি কোন সংবাদই নেবেন না?

এই প্রসঙ্গে আমার বাঙ্গলা দেশের Provincial Congress Committee-র কথা উল্লেখ করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আর লজ্জা বাড়িয়ে তুলতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

আমার এক আশা, সংসারের সমস্ত শক্তিই তরঙ্গ গতিতে অগ্রসর হয়। তাই তার উত্থান পতন আছে, চলার বেগে যে আজ নীচে পড়েছে, কাল সেই আবার উপরে উঠবে, নইলে চলা তার সম্পূর্ণ হবে না। পাহাড় গতিহীন, নিশ্চল, তাই তার শিখরদেশ একস্থানে উঁচু হয়েই থাকে, তাকে নামতে হয় না। কিন্তু বায়ু-তাড়িত সমুদ্রের সে ব্যবস্থা নয়—তার উঠা-পড়া আছে; সে তার লজ্জার হেতু নয়, সেই তার গতির চিহ্ন, তার শক্তির ধারা। তখনি সে কেবল উঁচু হয়ে থাকতে চায় যখন জমে বরফ হয়ে উঠে। তেমনি আমাদের এও যদি একটা movement, পরাধীন দেশের একটা অভিনব গতিবেগ, তা হলে উঠা-নামার আইন একেও মেনে নিতে হবে, নইলে চলতেই পারবে না।

কিন্তু সঙ্গে যারা চলবে তাদের রসদ যোগান চাই। রসদ না পেয়েও এতদিন কোনমতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছি, কিন্তু এখন আমরা ক্ষুধিত, ক্লান্ত, পীড়িত,—আমাদের বিদায় দিয়ে নূতন যাত্রী আপনারা মনোনীত করে নিন।

(১৯২২ সালের ১৪ই জুলাই হাওড়া জেলা-কংগ্রেস-কমিটির সভাপতিত্ব পরিত্যাগ-কালে পঠিত অভিভাষণ; উল্লেখ করা যাইতে পারে, পদত্যাগপত্র গৃহীত হয় নাই।)।

স্বরাজ সাধনায় নারী

শাস্ত্রে ত্রিবিধ দুঃখের কথা আছে। পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখকেই হয়ত ঐ তিনটির পর্যায়েই ফেলা যায়, কিন্তু আমার আলোচনা আজ সে নয়। বর্তমান কালে যে তিন প্রকার ভয়ানক দুঃখের মাঝখান দিয়ে জন্মভূমি আমাদের গড়িয়ে চলেছে, সেও তিন প্রকার সত্য, কিন্তু সে হচ্ছে রাজনৈতিক, আর্থিক এবং সামাজিক। রাজনীতি আমরা সবাই বুঝিনে, কিন্তু এ কথা বোধ করি অনায়াসেই বুঝতে পারি এই তিনটিই একেবারে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। একটা কথা উঠেছে, একা রাজনীতির মধ্যেই আমাদের সকল কষ্টের, সকল দুঃখের অবসান। হয়ত এ কথা সত্য, হয়ত নয়, হয়ত সত্যে-মিথ্যায় জড়ানো, কিন্তু এ কথাও কিছুতেই সত্য নয় যে, মানুষের কোন দিক দিয়েই দুঃখ দূর করার সত্যকার প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। যাঁরা রাজনীতি নিয়ে আছেন তাঁরা সর্বথা, সর্বকালেই আমাদের নমস্য। কিন্তু আমরা, সকলেই যদি তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবার সুস্পষ্ট চিহ্ন খুঁজে নাও পাই, যে দাগগুলো কেবল স্থূল দৃষ্টিতেই দেখতে পাওয়া যায়—আমাদের আর্থিক এবং সামাজিক স্পষ্ট দুঃখগুলো—কেবল এইগুলিই যদি প্রতিকারের চেষ্টা করি, বোধ হয় মহাপ্রাণ রাজনৈতিক নেতাদের স্কন্ধ থেকে একটা মস্ত গুরুভারই সরিয়ে দিতে পারি।

তোমার দীর্ঘ অবকাশের প্রাক্কালে, তোমাদের অধ্যাপক এবং আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়, এই শেষের দিকের অসহ্য বেদনার গোটা-কয়েক কথা তোমাদের মনে করে দেবার জন্যে আমাকে আহ্বান করেছেন এবং আমিও সানন্দে তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। এই সুযোগ এবং সম্মানের জন্য তোমাদের এবং তোমাদের গুরুস্থানীয়দের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিই।

এই সভায় আমার ডাক পড়েছে দু'টো কারণে। একে ত মৈত্রমশাই আমার বয়সের সম্মান করেছেন, দ্বিতীয়তঃ একটা জনরব আছে, দেশের পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে

আমি অনেক দিন ধরে অনেক ঘুরেছি। ছোট বড়, উঁচু নীচু, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ বহু লোকের সঙ্গে মিশে মিশে, অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করে রেখেছি। জনরব কে রটিয়েছে খুঁজে পাওয়া শক্ত, এবং এর মধ্যে যত অত্যুক্তি আছে, তার জন্য আমাকেও দায়ী করা চলে না। তবে হয়ত, কথাটা একেবারে মিথ্যাও নয়। দেশের নব্বই জন যেখানে বাস করে আছেন সেই পল্লীগ্রামেই আমার ঘর। মনের অনেক আগ্রহ, অনেক কৌতূহল দমন করতে না পেরে অনেক দিনই ছুটে গিয়ে তাঁদের মধ্যে পড়েছি, এবং তাঁদের বহু দুঃখ, বহু দৈন্যের আজও আমি সাক্ষী হয়ে আছি। তাঁদের সেই সব অসহ্য, অব্যক্ত, অচিন্তনীয় দুঃখ ও দৈন্য ঘোচাবার ভার নিতে আজ আমার দেশের সমস্ত নরনারীকে আহ্বান করতে সাধ যায়, কিন্তু কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হয়ে আসে, যখনই মনে হয় মাতৃভূমির এই মহাযজ্ঞে নারীকে আহ্বান করার আমার কতটুকু অধিকার আছে! যাকে দিইনি, তার কাছে প্রয়োজনে দাবী করি কোন্ মুখে? কিছুকাল পূর্বে 'নারীর মূল্য' বলে আমি একটা প্রবন্ধ লিখি।

সেই সময় মনে হয়, আচ্ছা, আমার দেশের অবস্থা ত আমি জানি, কিন্তু আরও ত ঢের দেশ আছে, তারা নারীর দাম সেখানে কি দিয়েছে? বিস্তর পুঁথিপত্র ঘেঁটে যে সত্য বেরিয়ে এল, তা দেখে একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। পুরুষের মনের ভাব, তার অন্যায় এবং অবিচার সর্বত্রই সমান। নারীর ন্যায্য অধিকার থেকে কমবেশি প্রায় সমস্ত দেশের পুরুষ তাঁদের বঞ্চিত করে রেখেচেন। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাই আজ দেশজুড়ে আরম্ভ হয়ে গেছে। স্বার্থ এবং লোভে, পৃথিবীজোড়া যুদ্ধে পুরুষে যখন মারামারি কাটাকাটি বাঁধিয়ে দিলে তখনই তাদের প্রথম চৈতন্য হল, এই রক্তারক্তিই শেষ নয়, এর উপরে আরও কিছু আছে। পুরুষের স্বার্থের যেমন সীমা নেই, তার নির্লজ্জতারও তেমনি অবধি নেই। এই দারুণ দুর্দিনে নারীর কাছে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াতে তার বাধল না। আমি ভাবি, এই বঞ্চিতার দান না পেলে এ সংসারব্যাপী নরযজ্ঞের প্রায়শ্চিত্তের পরিমাণ আজ কি হত? অথচ, এ কথা ভুলে যেতেও আজ মানুষের বাধেনি।

আজ আমাদের ইংরাজ Government-এর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ক্ষোভের অন্ত নেই। গালিগালাজও কম করিনে। তাদের অন্যায়ের শাস্তি তারা পাবে, কিন্তু কেবলমাত্র তাদেরই

ত্রুটির উপর ভর দিয়ে আমরা যদি পরম নিশ্চিন্তে আত্মপ্রসাদ লাভ করি তার শাস্তি কে নেবে? এই প্রসঙ্গে আমার কন্যাদায়গ্রস্ত বাপ-খুড়া-জ্যেঠাদের ক্রোধান্ধ মুখগুলি ভারী মনে পড়ে। এবং সেই-সকল মুখ থেকে যে-সব বাণী নির্গত হয় তা-ও মনোরম নয়। তাঁরা আমাকে এই বলে অনুযোগ করেন, আমি আমার বইয়ের মধ্যে কন্যাপণের বিরুদ্ধে মহা হৈচৈ করে তাঁদের কন্যাদায়ের সুবিধে করে দিইনে কেন?

আমি বলি, মেয়ের বিয়ে দেবেন না।

তাঁরা চোখ কপালে তুলে বলেন, সে কি মশায় কন্যাদায় যে!

আমি বলি, তাহলে কন্যা যখন দায় তখন তার প্রতিকার আপনিই করুন, আমার মাথা গরম করার সময়ও নেই, বরের বাপকে নিরর্থক গালমন্দ করবারও প্রবৃত্তি নেই। আসল কথা এই যে, বাঘের সুমুখে দাঁড়িয়ে, হাত জোড় করে তাকে বোষ্টম হতে অনুরোধ করায় ফল হয় বলেও যেমন আমার ভরসা হয় না, যে বরের বাপ কন্যাদায়ীর কান মুচড়ে টাকা আদায়ের আশা রাখে তাকেও দাতাকর্ণ হতে বলায় লাভ হবে বিশ্বাস করিনে। তার পায়ে ধরেও না, তাকে দাঁত খিঁচিয়েও না। আসল প্রতিকার মেয়ের বাপের হাতে, যে টাকা দেবে তার হাতে। অধিকাংশ কন্যাদায়ীই আমার কথা বোঝেন না, কিন্তু কেউ কেউ বোঝেন। তাঁরা মুখখানি মলিন করে বলেন,—সে কি করে হবে মশাই, সমাজ রয়েছে যে! সমস্ত মেয়ের বাপ যদি এ কথা বলেন ত আমিও বলতে পারি, কিন্তু একা ত পারিনে! কথাটা তাঁর বিচক্ষণের মত শুনতে হয় বটে, কিন্তু আসল গলদও এইখানে। কারণ, পৃথিবীতে কোন সংস্কারই কখনও দল বেঁধে হয় না! একাকীই দাঁড়াতে হয়। এর দুঃখ আছে। কিন্তু এই স্বেচ্ছাকৃত একাকীত্বের দুঃখ, একদিন সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বহুর কল্যাণকর হয়। মেয়েকে যে মানুষ বলে নেয়, কেবল মেয়ে বলে, দায় বলে, ভার বলে নেয় না, সে-ই কেবল এর দুঃখ বইতে পারে, অপরে পারে না। আর কেবল নেওয়াই নয়, মেয়েমানুষকে মানুষ করার ভারও তারই উপরে এবং এইখানেই পিতৃত্বের সত্যকার গৌরব।

এ-সব কথা আমি শুধু বলতে হয় বলেই বলছি নে; সভায় দাঁড়িয়ে মনুষ্যত্বের আদর্শের অভিমান নিয়েও প্রকাশ করছি নে, আজ আমি নিতান্ত দায়ে ঠেকেই এ কথা বলছি। আজ যাঁরা স্বরাজ পাবার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরছেন—আমিও তাঁদের একজন। কিন্তু আমার অন্তর্যামী কিছুতেই আমাকে ভরসা দিচ্ছেন না। কোথায় কোন অলক্ষ্যে থেকে যেন তিনি প্রতি মুহূর্তেই আভাস দিচ্ছেন এ হবার নয়। যে চেষ্টায়, যে আয়োজনে দেশের মেয়েদের যোগ নেই, সহানুভূতি নেই, এই সত্য উপলব্ধি করবার কোন জ্ঞান, কোন শিক্ষা, কোন সাহস আজ পর্যন্ত যাদের দিইনি, তাদের কেবল গৃহের অবরোধে বসিয়ে, শুদ্ধমাত্র চরকা কাটাতে বাধ্য করেই এত বড় বস্তু লাভ করা যাবে না। গেলেও সে থাকবে না। মেয়েমানুষকে আমরা যে কেবল মেয়ে করেই রেখেছি, মানুষ হতে দিইনি, স্বরাজের আগে তার প্রায়শ্চিত্ত দেশের হওয়া চাই-ই। অত্যন্ত স্বার্থের খাতিরে যে দেশ, যেদিন থেকে কেবল তার সতীত্বটাকেই বড় করে দেখেছে, তার মনুষ্যত্বের কোন খেয়াল করেনি, তার দেনা আগে তাকে শেষ করতেই হবে!

এইখানে একটা আপত্তি উঠতে পারে যে, নারীর পক্ষে সতীত্ব জিনিসটা তুচ্ছও নয়, এবং দেশের লোক তাদের মা-বোন-মেয়েকে সাধ করে যে ছোট করে রাখতে চেয়েছে তাও ত সম্ভব নয়। সতীত্বকে আমিও তুচ্ছ বলিনে, কিন্তু একেই তার নারী-জীবনের চরম ও পরম শ্রেয়ঃ জ্ঞান করাকেও কুসংস্কার মনে করি। কারণ, মানুষের মানুষ হবার যে স্বাভাবিক এবং সত্যকার দাবী, একে ফাঁকি দিয়ে, যে কেউ যে কোন একটা কিছুকে বড় করে খাড়া করতে গেছে, সে তাকেও ঠকিয়েছে নিজেও ঠকেছে। তাকেও মানুষ হতে দেয়নি, নিজের মনুষ্যত্বকেও তেমনি অজ্ঞাতসারে ছোট করে ফেলেছে। এ কথা তার মন্দ চেষ্টায় করলেও সত্য, তার ভাল চেষ্টায় করলেও সত্য। Frederic the Great মস্ত বড় রাজা ছিলেন, নিজের দেশের এবং দশের তিনি অনেক মঙ্গল করে গেছেন, কিন্তু তাদের মানুষ হতে দেননি। তাই তাঁকেও মৃত্যুকালে বলতে হয়েছে All my life I have been but a slave-Driver! এই উক্তির মধ্যে ব্যর্থতার কত বড় গ্লানি যে অঙ্গীকার করে গেছেন সে কেবল জগদীশ্বরই জেনেছিলেন।

আমার জীবনের অনেকদিন আমি Sociology-র (সমাজতত্ত্ব) ছাত্র ছিলাম। দেশের প্রায় সকল জাতিগুলিকেই আমার ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ হয়েছে,—আমার মনে হয় মেয়েদের অধিকার যারা যে পরিমাণে খর্ব করেছে, ঠিক সেই অনুপাতেই তারা, কি সামাজিক, কি আর্থিক, কি নৈতিক সকল দিক দিয়েই ছোট হয়ে গেছে। এর উলটো দিকটাও আবার ঠিক এমনি সত্য। অর্থাৎ, যে জাতি যে পরিমাণে তার সংশয় ও অবিশ্বাস বর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, নারীর মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা যারা যে পরিমাণে মুক্ত করে দিয়েছে,—নিজেদের অধীনতা-শৃঙ্খলও তাদের তেমনি ঝরে গেছে। ইতিহাসের দিকে চেয়ে দেখ। পৃথিবীতে এমন একটা দেশ পাওয়া যাবে না যারা মেয়েদের মানুষ হবার স্বাধীনতা হরণ করেনি, অথচ, তাদের মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা অপর কোন প্রবল জাত কেড়ে নিয়ে জোর করে রাখতে পেরেছে। কোথাও পারেনি—পারতে পারেও না, ভগবানের বোধ হয় তা আইনই নয়। আমাদের আপনাদের স্বাধীনতার প্রযত্নে আজ ঠিক এই আশঙ্কাই আমার বুকের উপর জাঁতার মত বসে আছে। মনে হয়, এই শক্ত কাজটা সকল কাজের আগে আমাদের বাকী রয়ে গেছে, ইংরাজের সঙ্গে যার কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই।

কেউ যদি বলেন, কিন্তু এই এশিয়ার এমন দেশও ত আজও আছে মেয়েদের স্বাধীনতা যারা একতিল দেয়নি, অথচ তাদের স্বাধীনতাও ত কেউ অপহরণ করেনি। অপহরণ করবেই এমন কথা আমিও বলিনি। তবুও আমি এ কথা বলি, স্বাধীনতা যে আজও আছে সে কেবল নিতান্তই দৈবাতের বলে। এই দৈববলের অভাবে যদি কখনও এ বস্তু যায়, ত আমাদেরই মত কেবলমাত্র দেশের পুরুষের দল কাঁধ দিয়ে এ মহাভার সূচ্যগ্রও নড়াতে পারবে না। শুধু আপাতদৃষ্টিতে এই সত্যের ব্যত্যয় দেখি ব্রহ্মদেশে। আজ সে দেশ পরাধীন। একদিন সে দেশে নারীর স্বাধীনতার অবধি ছিল না। কিন্তু যে দিন থেকে পুরুষে এই স্বাধীনতার মর্যাদা লঙ্ঘন করতে আরম্ভ করেছিল, সেই দিন থেকে, একদিকে যেমন নিজেরাও অকর্মণ্য, বিলাসী এবং হীন হতে শুরু করেছিল, অন্যদিকে তেমনি নারীর মধ্যেও স্বেচ্ছাচারিতার প্রবাহ আরম্ভ হয়েছিল। আর সেই দিন থেকেই দেশের অধঃপতনের সূচনা। আমি এদের অনেক শহর, অনেক গ্রাম, অনেক পল্লী

অনেকদিন ধরে ঘুরে বেড়িয়েছি, আমি দেখতে পেয়েছি তাদের অনেক গেছে কিন্তু একটা বড় জিনিস তারা আজও হারায়নি। কেবলমাত্র নারীর সতীত্বটাকে একটা ফেটিস করে তুলে তাদের স্বাধীনতা তাদের ভাল হবার পথটাকে কণ্টকাকীর্ণ করে তোলেনি। তাই আজও দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, আজও দেশের ধর্ম-কর্ম, আজও দেশের আচার-ব্যবহার মেয়েদের হাতে। আজও তাদের মেয়েরা একশতের মধ্যে নব্বুই জন লিখতে পড়তে জানে, এবং তাই আজও তাদের দেশ থেকে আমাদের এই হতভাগ্য দেশের মত আনন্দ জিনিসটা একেবারে নির্বাসিত হয়ে যায়নি। আজ তাদের সমস্ত দেশ অজ্ঞতা, জড়তা ও মোহের আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সত্য, কিন্তু একদিন, যেদিন তাদের ঘুম ভাঙবে, এই সমবেত নর-নারী একদিন যেদিন চোখ মেলে জেগে উঠবে, সেদিন এদের অধীনতার শৃঙ্খল, তা সে যত মোটা এবং যত ভারীই হোক, খসে পড়তে মুহূর্ত বিলম্ব হবে না, তাতে বাধা দেয় পৃথিবীতে এমন শক্তিমান কেউ নেই।

আজ আমাদের অনেকেরই ঘুম ভেঙ্গেছে। আমার বিশ্বাস এখন দেশে এমন একজনও ভারতবাসী নেই যে এই প্রাচীন পবিত্র মাতৃভূমির নষ্ট-গৌরব, বিলুপ্ত-সম্মান পুনরুজ্জীবিত না দেখতে চায়। কিন্তু কেবল চাইলেই ত মেলে না, পাবার উপায় করতে হয়। এই উপায়ের পথেই যত বাধা, যত বিঘ্ন, যত মতভেদ। এবং এইখানেই একটা বস্তুকে আমি তোমাদের চিরজীবনের পরম সত্য বলে অবলম্বন করতে অনুরোধ করি। এ কেবল পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা। যার যা দাবী তাকে তা পেতে দাও। তা সে যেখানে এবং যারই হোক। এ আমার বই-পড়া বড় কথা নয়, এ আমার ধার্মিক ব্যক্তির মুখে শোনা তত্ত্বকথা নয়,—এ আমার এই দীর্ঘ জীবনের বার বার ঠেকে শেখা সত্য। আমি কেবল এটুকু দিয়েই অত্যন্ত জটিল সমস্যার এক মুহূর্তে মীমাংসা করে ফেলি, আমি বলি মেয়েমানুষ যদি মানুষ হয়, এবং স্বাধীনতায়, ধর্মে, জ্ঞানে—যদি মানুষের দাবী আছে স্বীকার করি, ত এ দাবী আমাকে মঞ্জুর করতেই হবে, তা সে ফল তার যাই হোক। হাড়ী ডোমকে যদি মানুষ বলতে বাধ্য হই, এবং মানুষের উন্নতি করবার অধিকার আছে এ যদি মানি, তাকে পথ ছেড়ে আমাকে দিতেই হবে, তা সে যেখানেই গিয়ে পৌঁছাক। আমি বাজে ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে কিছুতেই তাদের হিত করতে যাইনে।

আমি বলিনে, বাছা, তুমি স্ত্রীলোক, তোমার এ করতে নেই, বলতে নেই, ওখানে যেতে নেই,—তুমি তোমার ভাল বোঝ না—এস আমি তোমার হিতের জন্যে তোমার মুখে পর্দা এবং পায়ে দড়ি বেঁধে রাখি। ডোমকেও ডেকে বলিনে, বাপু, তুমি যখন ডোম তখন এর বেশী চলাফেরা তোমার মঙ্গলকর নয়, অতএব এই ডিঙোলেই তোমার পা ভেঙ্গে দেব। দীর্ঘদিন বর্মাদেশে থেকে এটা আমার বেশ করে শেখা যে, মানুষের অধিকার নিয়ে গায়ে পড়ে মেলাই তার হিত করবার আবশ্যক নেই।

আমি বলি যার যা দাবী সে ষোল আনা নিক। আর ভুল-করা যদি মানুষের কাজেরই একটা অংশ হয়, ত সে যদি ভুল করে ত বিস্ময়েরই বা কি আছে, রাগ করবারই কি আছে। দুটো সুপরামর্শ দিতে পারি—কিন্তু মেরেধরে হাত-পা খোঁড়া করে ভাল তার করতেই হবে, এত বড় দায়িত্ব আমার নেই। অতখানি অধ্যবসায়ও নিজের মধ্যে খুঁজে পাইনে। বরঞ্চ মনে হয়, বাস্তবিক, আমার মত কুঁড়ে লোকের মত মানুষে মানুষের হিতাকাঙ্খাটা যদি জগতে একটু কম করে কোরত ত তারাও আরামে থাকত, এদেরও সত্যকার কল্যাণ হয়ত একটু-আধটু হবারও জায়গা পেত। দেশের কাজ, দেশের মঙ্গল করতে গিয়ে, এই কথাটা আমার তোমরা ভুলো না।

আজ তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কথা বলবার ছিল। সকল দিক দিয়ে কি করে সমস্ত বাঙ্গালা জীর্ণ হয়ে আসছে,—দেশের যারা মেরুমজ্জা সেই ভদ্র গৃহস্থ পরিবার কি করে কোথায় ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে আসছে, সে আনন্দ নেই, সে প্রাণ নেই, সে ধর্ম নেই, সে খাওয়া-পরা নেই; সমৃদ্ধ প্রাচীন গ্রামগুলা প্রায় জনশূন্য,—বিরাট প্রাসাদতুল্য আবাসে শিয়াল-কুকুর বাস করে; পীড়িত, নিরুপায় মৃতকল্প লোকগুলো যারা আজও সেখানে পড়ে আছে, খাদ্যাভাবে, জলাভাবে কি তাদের অবস্থা,—এইসব সহস্র দুঃখের কাহিনী তোমাদের তরুণ প্রাণের সামনে হাজির করবার আমার সাধ ছিল, কিন্তু এবার আমার সময় হলো না। তোমরা ফিরে এস, তোমাদের অধ্যাপক যদি আমাকে ভুলে না যান ত আর একদিন তোমাদের শোনাব। আজ আমাকে তোমরা ক্ষমা কর।

———-

(১৩২৮ সালে পূজার ছুটির পূর্বে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছাত্রদের সভায় পঠিত অভিভাষণ)

শিক্ষার বিরোধ

এতদিন এদেশে শিক্ষার ধারা একটা নির্বিঘ্ন নিরুপদ্রব পথে চলে আসছিল। সেটা ভাল কি মন্দ, এ বিষয়ে কারও কোন উদ্বেগ ছিল না। আমার বাবা যা পড়ে গেছেন, তা আমিও পড়ব। এর থেকে তিনি যখন দু'পয়সা করে গেছেন, সাহেব-সুবোর দরবারে চেয়ারে বসতে পেয়েছেন, হ্যাণ্ডশেক করতে পেয়েছেন, তখন আমিই বা কেন না পারবো? মোটামুটি এই ছিল দেশের চিন্তার পদ্ধতি। হঠাৎ একটা ভীষণ ঝড় এল। কিছুদিন ধরে সমস্ত শিক্ষাবিধানটাই বনিয়াদ সমেত এমনি টলমল করতে লাগল যে, একদল বললেন পড়ে যাবে। অন্যদল সভয়ে মাথা নেড়ে বললেন, না, ভয় নেই—পড়বে না। পড়লও না। এই নিয়ে প্রতিপক্ষকে তাঁরা কটু কথায় জর্জরিত করে দিলেন। তার হেতু ছিল। মানুষের শক্তি যত কমে আসে, মুখের বিষ তত উগ্র হয়ে ওঠে। বাইরে গাল তাঁরা ঢের দিলেন, কিন্তু অন্তরে ভরসা বিশেষ পেলেন না। ভয় তাঁদের মনের মধ্যেই রয়ে গেল, দৈবাৎ বাতাসে যদি আবার কোনদিন জোর ধরে ত এই গোড়া-হেলা নড়বড়ে অতিকায়টা হুমড়ি খেয়ে পড়তে মুহূর্ত বিলম্ব করবে না।

এমনি যখন অবস্থা তখন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলেত থেকে ফিরে এলেন, এবং পূর্ব ও পশ্চিমের শিক্ষার মিলন সম্বন্ধে উপর্যুপরি কয়েকটা বক্তৃতায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমার গুরুতুল্য পূজনীয়। সুতরাং মতভেদ থাকলেও প্রকাশ করা কঠিন। কেবলি ভয় হয় পাছে অজ্ঞাতসারে তাঁর সম্মানে কোথাও লেশমাত্র আঘাত করে বসি। কিন্তু এ তো কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মতামতের আলোচনা নয়,—যা তাঁরও বহু পূজ্য,—সেই দেশের সঙ্গে এ বিজড়িত। তাঁর কথা নিয়ে কয়েকটা Anglo-Indian কাগজ একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। থেকে থেকে তাদের প্যাঁচালো উপদেশের আর বিরাম নেই। আর কিছু না হোক দেশের হিতাকাঙ্খায় এদের যখন বুক ফাটতে থাকে তখনি ভয় হয়, ভেতরে

কোথাও একটা বড় রকমের গলদ আছে। বিশেষ করে বাঙ্গালী পরিচালিত একখানা Anglo-Indian কাগজ। এর মুখের ত আর কামাই নেই। নিজের বুদ্ধি দিয়ে কবির কথাগুলো বিকৃত, বিধ্বস্ত করে অবিশ্রাম বলছে—আমরা বলে বলে গলা ভেঙ্গে ফেলেছি, ফল হয়নি,—এখন রবিবাবু এসে রক্ষে করে দিলেন। যথা—

"And if there were any among educated Bengalees, who were wavering and vacillating, knowing not what to do,—to exclude the West or to stick to the East—Rabindranath's recent Calcutta lectures have gone a great way towards making up their minds. They have given up their sitting-on-the-fence posture; they have jumped off on the Western side."

অর্থাৎ আমরা দেশের শিক্ষিত সমাজ বেড়ার ডগায় বসেছিলাম, পশ্চিম-প্রত্যাগত কবির ইঙ্গিতে 'জয়রাম' বলে পশ্চিম দিকেই লাফিয়ে পড়লাম! বাঁচা গেল! শিক্ষিত সমাজের এতদিনে একটা কিনারা হল! কিন্তু শিক্ষিতের দল যা নিয়ে এতবড় রৈরৈ করেন, যাঁদের অশিক্ষিত অজ্ঞ প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করেন না,—তাঁদের যুক্তিতর্কে এর কি মূল্য দাঁড়ায় একবার সেটাও ওজন করা ভাল। কিন্তু মোটের উপর পূর্ব ও পশ্চিমের শিক্ষার মিলনে আসল কথা কবি কি বলেছেন?

প্রথম কথা বলেছেন এই যে, আজকের দিনে পশ্চিম জয়ী হয়েছে সুতরাং সেই জয়ের কৌশলটা তাদের কাছে আমাদের শেখা চাই। বেশ। দ্বিতীয় কথা, লড়াইয়ের পরে, পশ্চিম শোকাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করছে, 'ভারতের বাণী কৈ?' অতএব তাদের সেটা বলে দেওয়া আবশ্যক। এও ভাল কথা। আমি যতদূর জানি অসহযোগপন্থীর কেউ এ বিষয়ে কোন আপত্তি করে না। তৃতীয় দফায় কবি উপনিষদের ঋষিবাক্য উদ্ধৃত করে বলেছেন, "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্" অতএব "মা গৃধঃ"। চমৎকার কথা,—কারও কোন দ্বন্দ্ব নেই। এ যে একটা তত্ত্ব নয়, সমস্ত দুনিয়ায় এও কেউ লোকসমাজে অস্বীকার করে না, অথচ মানুষের এমন পোড়া স্বভাব যে, সে সরল ও সহজ সত্য কিছুতেই সোজা করে বলে মিটিয়ে নেবে না। আপন আপন স্বার্থ ও প্রয়োজন মত, তার মধ্যে অসংখ্য sub-clause,

অগণিত qualification-এর আমদানি করে তাকে এমনি ভারাক্রান্ত করে তুলবে যে, তত্ত্বকথা আপনি হেঁয়ালি হয়ে দাঁড়াবে। তখন অসঙ্কোচে তাকে সত্য বলে চিনে নেওয়াই কঠিন। শুধু এই জন্যই উপস্থিত fact গুলোই সংসারে সত্যের মুখোশ পরে, মানুষের কর্ম ও চিন্তার ধারার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করে, অপরিমেয় অনর্থের সূচনা করে দেয়।

কবি প্রথমেই বলেছেন :

"এ কথা মানতেই হবে যে, আজকার দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মত দোহন করেছে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল।...অধিকার ওরা কেন পেয়েছে? নিশ্চয়ই সে কোন একটা সত্যের জোরে।"

আজকের দিনে এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, পৃথিবীর বড় বড় ক্ষীরভাণ্ডেই সে মুখ জুবড়ে আছে,—তার পেট ভরে দুই কস বেয়ে দুধের ধারা নেমেছে—কিন্তু আমরা উপবাসী দাঁড়িয়ে আছি।

এ একটা fact; আজকের দিনে একে কিছুতেই 'না' বলবার পথ নেই,—আমরা উপবাসী রয়েছি সত্যই কিন্তু তাই বলেই কি এই কথা মানতেই হবে যে, এ অধিকার পেয়েছে তারা নিশ্চয়ই একটা সত্যের জোরে? এবং এই সত্য তাদের কাছ থেকে আমাদের শিখতেই হবে। লোহা মাটিতে পড়ে, জলে ডোবে, এ একটা fact, কিন্তু একেই যদি মানুষে চরম সত্য মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকত ত আজকের দিনে নীচে, জলের উপর এবং ঊর্ধ্বে আকাশের মধ্যে লোহার জাহাজ ছুটে বেড়াতে পারত না। উপস্থিত কালে যা fact তাই কেবল শেষ কথা নয়। মাসের ১লা তারিখে যে লোকটা তার বিদ্যের জোরে আমার সারা মাসের মাইনে গাঁট কেটে নিয়ে ছেলেপুলে সমেত আমাকে অনাহারে রাখলে, কিংবা মাথায় একটা বাড়ি মেরে সমস্ত কেড়ে নিয়ে রাস্তার ওপরে চাটের দোকানে বসে ভোজ লাগালে—এ ঘটনা সত্য হলেও কোন সত্য অধিকারে বলতে পারব না, কিংবা এ দুটো মহাবিদ্যে শেখবার জন্যে তাদের শরণাপন্ন হতে হবে এও স্বীকার করতে পারব না।

তা ছাড়া গাঁটকাটা কিছুতেই বলে দেবে না পয়সা কোথায় রাখলে কেটে নেওয়া যায় না, অথবা ঠেঙালেও শিখিয়ে দেবে না কি করে তার মাথায় উলটে লাঠি মেরে আত্মরক্ষা করা যায়। এ যদি বা শিখতেই হয়, ত সে অন্য কোথাও—অন্ততঃ তাদের কাছে নয়। কবি জোর দিয়ে বলেছেন, এ কথা মানতেই হবে পশ্চিম জয়ী হয়েছে এবং সে শুধু তাদের সত্য বিদ্যার অধিকারে। হয়ত মানতেই হবে তাই। কারণ সম্প্রতি সেই রকমই দেখাচ্ছে। কিন্তু কেবল মাত্র জয় করেছে বলে এই জয় করার বিদ্যাটাও সত্য বিদ্যা, অতএব শেখা চাই-ই, এ কথা কোন মতেই মেনে নেওয়া যায় না। গ্রীস একদিন পৃথিবীর রত্নভাণ্ডার লুটে নিয়ে গিয়েছিল, রোমও তাই করেছিল। আফগানেরাও বড় কম করেনি,—কিন্তু সেটা সত্যের জোরেও নয়, সত্য হয়েও থাকেনি। দুর্যোধন একদিন শকুনির বিদ্যার জোরে জয়ী হয়ে পঞ্চপাণ্ডবকে দীর্ঘকাল ধরে বনে-জঙ্গলে উপবাস করতে বাধ্য করেছিল, সেদিন দুর্যোধনের পাত্র ছাপিয়ে গিয়েছিল, তার ভোগের অন্নে কোথাও একটি তিলও কম পড়েনি, কিন্তু তাকেই সত্য বলে মেনে নিলে যুধিষ্ঠিরকে ফিরে এসে সারা জীবন কেবল পাশাখেলা শিখেই কাটাতে হোতো। সুতরাং সংসারে জয় করা বা পরের কেড়ে নেওয়ার বিদ্যাটাকেই একমাত্র সত্য ভেবে লুব্ধ হয়ে ওঠাই মানুষের বড় সার্থকতা নয়। তা ছাড়া জয় কি কেবল নির্ভর করে বিজেতার উপরেই? আফগান যখন হিন্দুস্থান জয় করেছিল, সে কি তার নিজের গুণে? হিন্দুস্থান দেশ হারিয়েছিল তার নিজের দোষে। সেই ত্রুটি সংশোধন করার বিদ্যে তার নিজের মধ্যেই ছিল, বিজেতা আফগানের কাছে শেখবার কিছুই ছিল না।

আবার এমন দৃষ্টান্তও ইতিহাসে দুষ্প্রাপ্য নয় যখন বিজেতাই পরাজিতের কাছে কি বিদ্যা, কি ধর্ম, কি সভ্যতা, কি ভদ্রতা সমস্তই শিক্ষা করে আর একদিন মানুষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কে বলেছে, সত্যকার বিষয় যদি কিছু তার থাকে তা শিখতে হবে না? কে বলেছে, তার দ্বার পশ্চিমমুখো থাকলে তাকে অহিন্দু বলে বয়কট করতে হবে? কি পদার্থবিদ্যা, কি রসায়নশাস্ত্র, কি ধনবিজ্ঞান—এ-সকল পশ্চিমি বিদ্যে শেখবার আবশ্যক নেই বলে কে বিবাদ করছে? বিবাদ যদি কিছু থাকে সে তার বিদ্যার উপরে নয়—সে তার শেখানোর ভান করার ওপর, শিক্ষার বদলে কুশিক্ষার আয়তনের ওপর। এতকাল এই

তামাশায় যোগ দিয়ে পাগলের মত সবাই নেচে বেড়াচ্ছিল, এখন হঠাৎ জন-কয়েক লোকের চৈতন্য হওয়ায় তারা পেছিয়ে দাঁড়িয়ে এই ফাঁকিটাকে কেবল আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে—এই ত দেখি আসলে মতভেদের কারণ।

এই বস্তুটাকেই একটু বিশদ করে দেখবার চেষ্টা করা যাক। পশ্চিমের পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র যতখানি বেড়ে উঠেছে গত যুদ্ধের সময়, এতখানি এইটুকু সময়ের মধ্যে বোধ করি আর কখনো হয়নি। মানুষ মারবার নব নব কৌশল এরা যত আবিষ্কার করেছে ততই আনন্দে দম্ভে এদের বুক ভরে উঠেছে। এই বিজ্ঞানের সাহায্যে আগুন দিয়ে, বিষ দিয়ে পুড়িয়ে গ্রামকে গ্রাম, শহরকে শহর ধ্বংস করবার কত ফন্দিই না এরা বার করেছে এবং আরও কত বার করত এই যুদ্ধটা আরও কিছুদিন অগ্রসর হলে। সৌভাগ্য এবং সভ্যতার বোধ করি এদের এই একটিমাত্র মাপকাঠি—কে কত অল্প পরিশ্রমে কত বেশী মানব হত্যা করতে পারে। এদের কাছে বিজ্ঞানের এইটাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন। এ যে দেখতে না পায় সে অন্ধ এবং এই বিদ্যাটা অপরকে এরা শিখাতে পারে, কিংবা শেখবার সুযোগ দিতে পারে, অতি বড় কবি-কল্পনাতেও এ আমি ভাবতে পারি না। কথা উঠতে পারে, মানবের কল্যাণকর এমন কি কিছুই এর থেকে আবিষ্কৃত হয়নি? হয়েছে বৈ কি। কিন্তু সে নিতান্তই by-product-এর মত বলা যেতে পারে। হোক by-product কিন্তু সে যখন মানবের হিতার্থে, তখন সেই বিদ্যাগুলো আয়ত্ত করেও ত আমরা মানুষ হতে পারি! হয়ত পারি। কিন্তু ঠিক ও উপায়ে নয়। পশ্চিমের সভ্যতার অহঙ্কার অভ্রভেদী। আমাদের এবং আমাদের মত আরও অনেক দুর্ভাগা জাতির কাঁধে যখনই ওরা চেপে থাকে তখনই ঘরে বাইরে এই কৈফিয়ত দেয় যে, এগুলো দেখতে শুনতে মানুষের মত হলেও ঠিক মানুষ নয়। অন্ততঃ সাবালক মানুষ নয়, ছেলেমানুষ। বেলজিয়ম যখন রবারের জন্য নিগ্রোদের দেশে গিয়ে নিগ্রোদেরই হাত কেটে দিত তখনও সেই অজুহাতই তারা দিয়েছিল যে, এরা আমাদের হুকুম মানতে চায় না। এরা অসভ্য। অতএব আমরা গায়ে পড়ে এদের সভ্য করবার, মানুষ করবার ভার যখন নিয়েছি তখন মানুষ এদের করতেই হবে। অতএব শিক্ষার জন্য এদের কঠোর শাস্তি দেওয়া একান্তই আবশ্যক। তথাস্তু বলা ছাড়া ওর যে আর কি জবাব আছে আমি জানি না। আমাদের অর্থাৎ

ভারতবাসীর সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলেও ইংরাজ ঠিক এই জবাবটাই দিয়ে আসছে যে, এরা অর্ধসভ্য—ছেলেমানুষ। এদের দেশে প্রচুর অন্ন, কিন্তু পাছে অবোধ শিশুর মত বেশি খেয়ে পীড়িত হয়ে পড়ে তাই এদের মুখের গ্রাস নিজেদের দেশে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি—সে এদেরই ভালোর জন্যে।

আবার টাকাকড়িগুলো পাছে অপব্যয় করে নষ্ট করে ফেলে তাই সে-সমস্ত দয়া করে আমরাই খরচ করে দিচ্ছি; সেও এদেরই মঙ্গলের নিমিত্ত। এমনি সব ভালো করার কত কি অফুরন্ত কাহিনী ডেকে হেঁকে প্রচার করছেন—কত কষ্ট করে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এদের মানুষ করতে এসেছি;—কারণ মানুষ করার sacred duty যে আমাদেরই ওপরে। কিন্তু আঃ,—গেলাম! By law established হয়ে এই ইণ্ডিয়ানগুলোকে মানুষ করতে করতেই হয়রান হয়ে মোলাম।

ভগবান জানেন কবে এরা আবার by law disestablished হবে! কবে আমরা মানুষ হয়ে এদের দুশ্চিন্তা মুক্ত করতে পারব! দেড়-শ' বছর ধরে তালিম দেওয়া চলছে, কিন্তু মানুষ আর হলাম না। কবে যে হতে পারব সেও ওরাই জানে আর জগদীশ্বর জানেন। কিন্তু ঐ দেড়-শ' বছরেও যদি ওই মোহ আমাদের ঘুচে না থাকে, যে এদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় সত্যিই একদিন মানুষ হয়ে উঠব, সত্যি সত্যিই আমাদের মানুষ করে নিজেদের মৃত্যুবাণ স্বেচ্ছায় আমাদের হাতে তুলে দিতে এরা ব্যাকুল, তা হলে আমি বলি আমাদের কোন কালে মানুষ না হওয়াই উচিত! ভগবান যেন কোন দিন এই দুর্ভাগাদের পরে প্রসন্ন না হন!

বস্তুতঃ, এ কথা বোঝা কি এতই কঠিন যে, বিজ্ঞানের যে শিক্ষায় মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে, তার আত্মসম্মান জাগ্রত হয়ে দাঁড়ায়, সে উপলব্ধি করে সেও মানুষ, অতএব স্বদেশের দায়িত্ব শুধু তারই, আর কারও নয়,—পরাজিতের জন্য এমনি শিক্ষার ব্যবস্থা বিজেতা কি কখনও করতে পারে? তার বিদ্যালয়, তার শিক্ষার বিধি সে কি নিজের সর্বনাশের জন্যেই তৈরি করিয়ে দেবে? সে কেবলমাত্র এইটুকুই দিতে পারে যাতে তার

নিজের কাজগুলি সুশৃঙ্খলায় চলে। তার আদালতে বিচারের বহুমূল্য অভিনয় করতে উকীল, মোক্তার, মুন্সেফ, হুকুম মত জেলে দিতে ডেপুটি, সব্‌ডেপুটি, ধরে আনতে থানায় ছোট-বড় পিয়াদা, ইস্কুলে ডুবালের পিতৃভক্তির গল্প পড়াতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মাস্টার, কলেজে ভারতের হীনতা ও বর্বরতার লেকচার দিতে নখদন্তহীন প্রফেসার, আফিসে খাতা লিখতে জীর্ণ-শীর্ণ কেরানী,—তার শিক্ষাবিধান এর বেশি দিতে পারে এও যে আশা করতে পারে, সে যে পারে না কি আমি তাই শুধু ভাবি। অথচ কবি বলেছেন বাঁচবার বিদ্যা, কিংবা মানুষ হবার বিদ্যা আছে কেবল শুক্রাচার্যের হাতে, আজ তার বাড়ি পশ্চিমে। সুতরাং মানুষ হতে যদি চাই তার আশ্রমে আজ আমাদের দৌড়াতেই হবে, 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'। অমৃত-লোকের লোক হয়েও কচকে তার শিষ্যত্ব স্বীকার করতে হয়েছিল। হয়েছিল সত্য, কিন্তু বিদ্যা ত কচ সহজে আদায় করতে পারেনি, গুরুদেবের ভোজ্য পদার্থ পর্যন্ত হতে হয়েছিল। কিন্তু দিনকাল এখন বদলে গেছে,—আমাদের দুরদৃষ্টে যদি গুরুদেবের ভোজনপর্ব পর্যন্ত হয়েই নাটক সমাপ্ত হয়ে যায়, তামাশার বাকী আর কিছু থাকবে না।

কিন্তু আমাদেরই বা এত দুঃখ, এত বেদনা কেন? কবি বলেছেন, সেটা একেবারে নিছক আমাদের নিজেরই অপরাধ। আমি কিন্তু এই উক্তিটাকে পুরোপুরি স্বীকার করতে পারিনে। আমার মনে হয় প্রত্যেক মানব-জীবনের দুঃখের অধ্যায়েই আর অপরাধ ছাড়াও একটা জিনিস আছে যা তার অদৃষ্ট, যে বস্তু তার দৃষ্টির বাহিরে, এবং যার ওপর তার কোন হাত নেই। তেমনি একটা সমগ্র জাতিরও দুঃখের মূলে তার দোষ ছাড়াও এমন বস্তু আছে যা তার সাধ্যের অতীত, যা তার দুর্ভাগ্য।

আমাদের দেশের ইতিহাস যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা বোধ হয় সম্পূর্ণ অসত্য বলে এ কথা উড়িয়ে দেবেন না। দুঃখ ও হীনতার মূলে আমাদের অদৃষ্ট বস্তুও অনেকটা দায়ী, যার ওপর আমাদের কর্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু কবি এ কথা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা করে উপমাচ্ছলে একটা গল্প বলেছেন। গল্পটা এই :

"মনে কর এক বাপের দুই ছেলে। বাপ স্বয়ং মোটর হাঁকিয়ে চলেন। তাঁর ভাবখানা এই, ছেলেদের মধ্যে মোটর চালাতে যে শিখবে মোটর তারই হবে। ওর মধ্যে একটি চালাক ছেলে আছে, তার কৌতূহলের অন্ত নেই। সে তন্ন তন্ন করে দেখে গাড়ি চলে কি করে। অন্য ছেলেটি ভালমানুষ, সে ভক্তিভরে বাপের পায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, তাঁর দুই হাত মোটরের হাল যে কোন্ দিকে কেমন করে ঘোরাচ্চে তার দিকেও খেয়াল নেই। চালাক ছেলেটি মোটরের কল-কারখানা পুরোপুরি শিখে নিলে এবং একদিন গাড়িখানা নিজের হাতে বাগিয়ে নিয়ে ঊর্ধ্বস্বরে বাঁশী বাজিয়ে দৌড় মারল। গাড়ি চালাবার শখ দিন রাত এমনি তাকে পেয়ে বসল যে, বাপ আছেন কি নেই সে হুঁশই তার রইল না। তাই বলেই তার বাপ যে তাকে তলব করে গালে চড় মেরে তার গাড়িটা কেড়ে নিলেন তা নয়; তিনি স্বয়ং যে রথের রথী, ছেলেও সেই রথেরই রথী, এতে তিনি প্রসন্ন হলেন। ভালমানুষ ছেলেটি দেখলে ভায়াটি তার পাকা ফসলের ক্ষেত লণ্ডভণ্ড করে তার মধ্যে দিয়ে দিনে দুপুরে হাওয়া গাড়ি চালিয়ে বেড়াচ্চে, তাকে রোখে কার সাধ্য, তার সামনে দাঁড়িয়ে বাপের দোহাই পাড়লে 'মরণং ধ্রুবম্',—তখনো সে বাপের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল, আর বললে আমার আর কিছুতে দরকার নেই।"

এই গল্পের সার্থকতা যে কি আমি বুঝতে পারিনি। ছেলে-দুটি কে তা অনুমান করা শক্ত নয়; কিন্তু এক ছেলের প্রতি আর এক ছেলের অকারণ দৌরাত্ম্য দেখে যে বাপ প্রসন্ন হন, তিনি যে কিরূপ বাপ তা বোঝা যায় না! তবে এ কথা বেশ বোঝা যায়, এমন বাপের পায়ের দিকে যে ছেলে তাকিয়ে থাকে,—তা তিনি যত বড় রথেরই রথী হোন, তার 'মরণং ধ্রুবম্' ।

অতঃপর কবি এই দুটি ছেলের জীবন-বৃত্তান্তও দিয়েছেন। মোটর-হাঁকানো ছেলেটি ত ম্যাজিক থেকে বিজ্ঞানের ক্লাসে প্রোমোশন পেলে, কিন্তু যে ছেলেটির 'মরণং ধ্রুবম্' সে তার ম্যাজিক ও তন্ত্র-মন্ত্র নিয়েই পড়ে রইল। এই তন্ত্র-মন্ত্রের পরে কঠোর কটাক্ষ কবি পূর্বেও করেছেন। তাঁর 'অচলায়তনে' এ নিয়ে হাসি-তামাশা অনেক হয়ে গেছে, যাঁরা

ওয়াকিফ্‌হাল তাঁরা এর মীমাংসা করবেন, কিন্তু আমার মনে হয় এখানে এ সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

বিশ্ববস্তুর পেছনে যে কোন-একটা অজ্ঞেয় শক্তি আছে, মানব ইতিহাসে এ একটা প্রাচীন তথ্য। এবং আজ বিংশ শতাব্দীতেও কূলকিনারা তার তেমনি অজ্ঞাত। সেই অজ্ঞেয় শক্তিকে প্রসন্ন করে কাজ আদায়ের চেষ্টা মানুষ চিরদিন করে আসছে,—আজও তার উপায় বার হয়নি, অথচ আজও তার অবসান নেই। এই উপায় আবিষ্কারের পথে কি করে যে প্রার্থনা একদিন ম্যাজিকে অর্থাৎ মন্ত্র-তন্ত্রে এবং ম্যাজিক আর একদিন প্রার্থনায় চেহারা বদলে দাঁড়ায় এ তর্ক তুলে পুঁথি বাড়াতে আমার সাধ নেই। ঈশ্বরের ধারণার অভিব্যক্তির ইতিহাসের এই অংশটা বিজ্ঞানের পরিণতির প্রশ্নে আমার অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়।

সে যাই হোক, এই মোটর-হাঁকানো ছেলেটির উন্নতির হেতুবাদ এবং সেই পায়ের-দিকে-তাকানো ভালো ছেলেটির দুঃখের বিবরণ কবি এইখানে একবারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যথা :

"পূর্বদেশে আমরা যে সময় রোগ হলে ভূতের ওঝাকে ডাকচি, দৈন্য হলে গ্রহ-শান্তির জন্যে দৈবজ্ঞের দ্বারে দৌড়াচ্চি, বসন্তমারীকে ঠেকিয়ে রাখবার ভার দিচ্চি শীতলা দেবীর পরে, আর শত্রুকে মারবার জন্যে মারণ-উচ্চাটন মন্ত্র আওড়াতে বসেচি, ঠিক সেই সময় পশ্চিম মহাদেশে ভল্‌টেয়ারকে একজন মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শুনেচি নাকি মন্ত্রগুণে পালকে পাল ভেড়া মেরে ফেলা যায়, সে কি সত্য? ভল্‌টেয়ার জবাব দিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই মেরে ফেলা যায় কিন্তু তার সঙ্গে যথোচিত পরিমাণে সেঁকো বিষ চাই থাকা। ইউরোপের কোন কোণে-কানাচে যাদু-মন্ত্রের পরে বিশ্বাস কিছুমাত্র নেই এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু এ সম্বন্ধে সেঁকো বিষটার প্রতি বিশ্বাস সেখানে প্রায় সর্ববাদিসম্মত। এই জন্যেই ওরা ইচ্ছা করলেই মারতে পারে এবং আমরা ইচ্ছে না করলেও মরতে পারি।"

কবির এ অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহলে বলার আর কিছু নেই। আমাদের সব মরাই উচিত, এমন কি, সেঁকো বিষ খেতেও কারো আপত্তি করা কর্তব্য নয়। কিন্তু এই কি সত্য? ভল্‌টেয়ার বেশী দিনের লোক নন, তাঁর মত পণ্ডিত ও জ্ঞানী তখন সে দেশে বড় সুলভ ছিল না, অতএব এ কথা তাঁর মুখে কিছুই অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু তখনকার দিনে অজ্ঞান ও বর্বরতায় কি এ দেশটা এতখানিই নীচের ধাপে নেবে গিয়েছিল যে ঠিক এমনি কথা বলবার লোক এখানে কেউ ছিল না যে বলে, "বাপু, ভূতের ওঝা না ডাকিয়ে বৈদ্যের বাড়ি যাও, মারতে চাও ত অন্য পথ অবলম্বন কর, কেবল ঘরে বসে নিরালায় মারণ-মন্ত্র জপ করলেই কার্য সিদ্ধ হবে না!" ইউরোপের জয়গান করতে আমি নিষেধ করিনে, কিংবা যে হাতি দঁকে পড়ে গেছে তাকে নিয়ে আস্ফালন করবারও আমার রুচি নেই, কিন্তু তাই বলে ভূতের ওঝা ও মারণ-উচ্চাটন মন্ত্র-তন্ত্রের ইঙ্গিতও নির্বিবাদে হজম করতে পারিনে! 'গোরা' বলে বাঙ্গালা সাহিত্যে একখানি অতি সুপ্রসিদ্ধ বই আছে; কবি যদি একবার সেখানি পড়ে দেখেন ত দেখতে পাবেন তার একান্ত স্বদেশভক্ত গ্রন্থকার গোরার মুখ দিয়ে বলেছেন,—"নিন্দা পাপ, মিথ্যা নিন্দা আরও পাপ, এবং স্বদেশের মিথ্যা নিন্দার মত পাপ সংসারে অল্পই আছে।"

কবি বলেছেন, যাদু-মন্ত্রের পরিণতিই হচ্ছে বিজ্ঞানে। কোনও একটা বস্তু কত দিক থেকে যে পরিণত হয়ে ওঠে সে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু এই কি ঠিক যে ইউরোপ তার যাদুবিদ্যার নালা এক লাফে ডিঙিয়ে গেল, আর আমরা দেশসুদ্ধ লোক মিলে ঘাড়-মোড় ভেঙ্গে সেই পাঁকেই চিরকাল পুঁতে রইলাম। বাইরের দিকে বিশ্ববস্তু যে একটা প্রকাণ্ড কল, এর অখণ্ড, অব্যাহত নিয়মের শৃঙ্খল যে যাদুবিদ্যায় ভাঙ্গে না, সংসারে যা-কিছু ঘটে তারই একটা হেতু আছে, এবং সেই হেতু কঠোর আইন-কানুনে বাঁধা, অর্থাৎ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথার্থ জনক-জননী বিশ্ব-জগতে কার্য-কারণের সত্য ও নিত্য সম্বন্ধের ধারণা কি এই দুর্ভাগ্য পূর্বদেশে কারও ছিল না? এবং এই তত্ত্ব প্রচারের চেষ্টা কি পশ্চিম হতে আমদানি না করতে পারলে আমাদের ভাগ্যে মারণ-উচ্চাটন মন্ত্র-তন্ত্রের বেশি আর কিছুই মিলতে পারে না? পশ্চিমের বিদ্যার অনেক গুণ থাকতে পারে, কিন্তু সে যদি আমাদের নিজেদের প্রতি কেবল অনাস্থাই এনে দিয়ে থাকে, আমাদের জ্ঞান, আমাদের ধর্ম,

আমাদের সমাজ-সংস্থান, আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি সকলের প্রতি যদি শুধু অশ্রদ্ধাই জন্মিয়ে দিয়ে থাকে, ত মনে হয়, লুব্ধচিত্তে পশ্চিমের শুক্রাচার্যের পানে আমাদের না তাকানোই ভাল। বস্তুতঃ এই ত নাস্তিকতা।

আমি পূর্বেই বলেছি, যে-শিক্ষায় মানুষ সত্যকারের মানুষ হয়ে উঠতে পারে—অন্ততঃ তাদের মানুষের ধারণা যা, —তা' তারা আমাদের দেয়নি, দেবে না এবং আমার বিশ্বাস দিতে পারেও না। এই সুদীর্ঘকাল পশ্চিমের সংসর্গেও যে আমরা কি হয়ে আছি, মাত্র সেইটুকুই কি এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ নয়? পেয়েছি কেবল এই শিক্ষা—যাতে নিজেদের সর্ববিষয়ে অবজ্ঞা এবং তাদের যা কিছু সমস্তের পরেই আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জন্মে গেছে। আর তাদের ভিতরের দ্বার এমন অবরুদ্ধ বলেই অবনতিও আজ আমাদের এত গভীর। সেটা ত জানবার পথ নেই, তাই শুধু তাদের বাহিরের সাজসজ্জা দেখে একদিকে নিজেদের প্রতি যেমন ঘৃণা, অন্য দিকে তাদের প্রতিও ভক্তির আবেগ একেবারে শতধারে উৎসারিত হয়ে উঠেছে। তাই, একদিন আমাদের দেশের একদল লোক নির্বিচারে ঠিক করেছিলেন, ঠিক ওদের মত হতে না পারলে আর আমাদের মুক্তি নেই! ওদের জাতিভেদ নেই—অতএব সেটা ঘোচানো চাই, ওদের স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে—অতএব সেটা না হলেই নয়, তাদের খাওয়া-দাওয়ার বাচ-বিচার নেই—সুতরাং ওটা না তুললেই আর রক্ষা নেই, তাদের মন্দির নেই—অতএব আমাদেরও গীর্জার ব্যবস্থা চাই, তারা ভাড়া করে ধর্ম-প্রচারক রাখে সুতরাং আমাদেরও ওটা অত্যাবশ্যক—এমনি কত কি! কেবল গায়ের চামড়াটা বদলাবার ফন্দি তাঁরা খুঁজে পাননি, নইলে আজ তাঁদের চেনাও যেত না! অথচ, আমি এর দোষ-গুণের বিচার করচি নে, আমি সরলচিত্তে বলছি, কোন দল বা ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করবার আমার লেশমাত্র অভিরুচি নেই, আমি কেবল এর mentality-টাই আপনাদের গোচর করবার প্রয়াস করচি। এই যে বিদেশের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও স্বদেশের প্রতি নিদারুণ বিরাগ, এ শুধু সম্ভবপর হয়েছিল তাদের অন্দরের পথটা চিরদিন বন্ধ ছিল বলে। তাই এদের সংসর্গে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের চোখে ওদের বাইরের মোহটা এমনি পেয়ে বসেছিল যে, এ তত্ত্ব আবিষ্কার করতে তাঁদের মুহূর্ত বিলম্ব ঘটেনি যে, বাইরে থেকে যেটুকু দেখা যাচ্ছে, কেবল সেইটুকুর হুবহু নকল করলেই,

তাঁরাও অমনি মানুষ হয়ে ওদের অন্তরে পঙ্‌ক্তি-ভোজনে সরাসরি বসে যেতে পারবেন। সংসারে যা-কিছু অজ্ঞাত, গোপন, যার ভিতরে প্রবেশের পথ নেই, তার প্রতি বাইরের লোকের লোভের অবধি থাকে না। তাই এ কথা তাঁদের স্বতঃসিদ্ধের মত মেনে নিতে কোথাও কিছুমাত্র বাধেনি যে, মানুষ হবার সত্যকার সজীব মন্ত্রটি কেবল ওদের এই নিগূঢ় মর্মস্থানটিতেই চাপা দেওয়া আছে, কোন মতে ওর সন্ধান না পেলে আমাদের মনুষ্যজন্ম সার্থক করবার দ্বিতীয় পন্থা নেই। এই ভ্রান্তিটা চোখ মেলে দেখবার আজ দিন এসেছে।

শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে। সে শুধু দেহের গঠনে নয়, সে অন্তরের আত্মায়। এই যে শিক্ষার প্রণালী নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদ চলেছে,—ওদের শিক্ষা অত্যন্ত মহার্ঘ, অত বড় বড় বাড়ি কি হবে? কি হবে টানা পাখায়? কাজ কি আমার টেবিল চেয়ারে,—দূর করে দাও মোটা মাইনের বিলিতী প্রফেসার—তার খরচ যোগাতেই যে দেশের বাপ-মা পাগল হয়ে গেল,—এমনি আরও কত শত। এর কোনটাই মিথ্যে নয়, কিন্তু এও আমার কাছে তুচ্ছ মনে হয়, যখন ভাবি পশ্চিম ও পূর্বের শিক্ষার সংঘর্ষ ঠিক কোন্‌খানে? এদের সত্য মিলনের যথার্থ অন্তরায় কোথায়? একি কেবল গোটা-কতক সাজগোজ বদলালেই হবে?

টেবিল-চেয়ারের বদলে লম্বা লম্বা মাদুর পেতে, ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানের পরিবর্তে তালপাখা এনে, কিংবা মোটা মাইনের প্রফেসারের বদলে রোগা মাইনের দিশী অধ্যাপক আমদানি করে কিংবা বড়জোর বিদেশী ভাষার মিডিয়মের স্থানে স্বদেশী ভাষায় লেক্‌চারের আইন করলেই দুঃখ দূর হবে? দুঃখ কিছুতেই ঘুচবে না, যতক্ষণ না সেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, যাতে দেশের বহির্মুখী বীতশ্রদ্ধ মন আর একবার অন্তর্মুখী ও আত্মস্থ হয়। মনের মিলনই বা কি, আর শিক্ষার মিলনই বা কি, সে কেবল হতে পারে সমানে সমানে শ্রদ্ধার আদান-প্রদানে। এমন কাঙালের মত, ভিক্ষুকের মত কিছুতেই হবে না। হলেও সে শুধু একটা গোঁজামিল হবে,—তাতে কল্যাণ নেই, গৌরব নেই, দেশকে সে কেবল হীনতা ও লাঞ্ছনাই দেবে, কোন দিন মনুষ্যত্ব দেবে না।

আমার এ-সব কথার কথা নয়,—উদ্দীপনাপূর্ণ স্বদেশী লেক্‌চার নয়,—সত্য সত্যই যা আমি সত্য বলে বুঝেছি তাই কেবল আপনাদের কাছে বলছি। মানুষের একপ্রকার শিক্ষা আছে, যা কেবল নিছক ব্যক্তিগত সুখ ও সুবিধার খাতিরে মানুষে অর্জন করতে চায়। যে mentality থেকে আমাদের এদেশে কেউ কেউ ইংরিজী ভাষাটা সাহেবের গলায় বলাটাকেই চরম উন্নতি জ্ঞান করে, এবং এই mentality-রই এক ধাপ নীচের লোকগুলো জাহাজে এবং রেলগাড়িতে সাহেবি পোশাক ছাড়া কিছুতেই বেড়াতে চায় না। এবং এই জিনিসটা এত ইতর, এত ক্ষুদ্র যে, এ কেন হয়, এর কি উদ্দেশ্য এ বিষয় আলোচনা করতেও ঘৃণা বোধ হয়। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি এই ছদ্মবেশের হীনতা, এই আপনার কাছ থেকে আপনাকে লুকোবার পাপ, এবং গভীর লাঞ্ছনা আপনারা অনায়াসেই উপলব্ধি করতে পারবেন। এবং প্রসঙ্গক্রমে এ কথা কেন যে উত্থাপিত করলাম তাও বুঝতে আপনাদের বাকী থাকবে না।

এইখানে জাপানের কথা স্মরণ করে কেউ কেউ বলতে পারেন, এই যদি সত্য, তবে জাপান আজ এমন হলো কিসের জোরে? তার চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার ইতিহাসটা একবার ভেবে দেখ! ভেবে আমি দেখেছি। পশ্চিমের শুক্রাচার্যের শিষ্যত্বের জোরেই যদি সে আজ বড় হয়ে থাকে, তবে বড়ত্বটাও মেপে দেখেছি আমরা শুক্রাচার্যেরই মাপকাঠি দিয়ে। কিন্তু মানবত্ব বিকাশের সেই কি শেষ মানদণ্ড? জাতীয় জীবনে এই দু' শো পাঁচ শো বছরের ঘটনাই কি তার চরম ইতিহাস?

আমি জাপানের ইতিহাস জানিনে। তার কি ছিল এবং কি হয়েছে এ বিষয়ে আমি অনভিজ্ঞ, কিন্তু এই তার পার্থিব উন্নতির মূলে, পশ্চিমের সভ্যতার পদতলে যদি তার আত্মসমর্পণের সূচনাই করে থাকে, ত তারস্বরে আনন্দধ্বনি করবার বোধ হয় বেশি কারণ নেই। এবং এমনি দুর্দিন যদি কখনো ভারতের ভাগ্যে ঘটে,—সে তার বিগত জীবনের সমস্ত tradition বিস্মৃত হয়ে ঠিক অতখানি উন্নত হয়েই ওঠে, এক কালো চামড়া ছাড়া পশ্চিমের সঙ্গে তার কোন প্রভেদই না থাকে, ত ভারতের ভাগ্য-বিধাতা উপরে বসে সে দিন হাসবেন কি নিজের চুল ছিঁড়বেন বলা কঠিন।

কোন বড় জিনিসই কখনো নিজের অতীতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে, নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে হয় না—হবার জো-ই নেই। তাদের যে বিদ্যাটার প্রতি আমাদের এত লোভ, তা তাদের মাথায় হাত বুলিয়েই শিখে নিই, বা পায়ে তেল মাখিয়েই অর্জন করি—এর ফল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী যদি না সে দেশের প্রতিভার ভিতর থেকে সৃষ্ট হয়ে ওঠে, এর মূল যদি না জাতির অতীতের মর্মস্থল বিদীর্ণ করে এসে থাকে। এই ফুল সমেত বৃক্ষশাখা, তা সে বর্ণে ও গন্ধে যত দামীই হোক, একদিন শুখোবেই শুখোবে, কোন কৌশলই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

এই সত্যটা আজ আমাদের একান্তই বোঝবার দিন এসেচে যে, ঠকিয়ে-মজিয়েই হোক বা কেড়ে-বিকড়েই হোক, নানা দেশ থেকে টেনে এনে জমা করাটাই দেশের সম্পদ নয়। যথার্থ সম্পদ দেশের প্রয়োজনের মধ্যে থেকেই গড়ে ওঠে। তার অতিরিক্ত যা সে শুধুই ভার, নিছক আবর্জনা। পরের দেখে আমরাও যেন ওই ঐশ্বর্যের প্রতি লুব্ধ হয়ে না উঠি। আমাদের জ্ঞান, আমাদের অতীত আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছিল, আজ অপরের শিক্ষার মোহে যদি নিজের শিক্ষাকে হেয় মনে করে থাকি ত সে পরম দুর্ভাগ্য। ঐ যে ট্রাম, ঐ যে মোটর পথের উপর দিয়ে বায়ুবেগে ছুটেছে, ঐ যে ঘরে ঘরে electric পাখা ঘুরচে, ঐ যে শহরের আলোর মালার আদি অন্ত নেই, ঐ যে শত সহস্র বিদেশী সভ্যতার তোড়জোড় বিদেশ থেকে বয়ে এনে জমা করেচি, ওর কোনটাই কি আমাদের যথার্থ সম্পদ? বিগত যুদ্ধের দিনের মত আবার যদি কোন দিন ওর আমদানির মূল শুকিয়ে যায় ত ভোজবাজির মত ওদের অস্তিত্ব এ দেশ থেকে উঠে যেতে বিলম্ব হবে না। ও-সকল আমরা সৃষ্টি করিনি, করতেও জানিনে। পরের কাছ থেকে বয়ে আনা। আজ ও-সকল আমাদের না হলেও নয়, অথচ, ওর কোনটাই আমাদের যথার্থ প্রয়োজনের ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠেনি। এই যে দেখাদেখি প্রয়োজন, এ যদি আমরা গড়তেও না পারি, ছাড়তেও না পারি তা হলে দুষ্ট-ক্ষুধার মত ও কেবল আমাদের একদিকে প্রলুব্ধ এবং অন্যদিকে পীড়িতই করতে থাকবে। কিন্তু পশ্চিম ওদের সৃষ্টি করেচে নিজের গরজ থেকে। তাদের সভ্যতায় ও-সকল চাই-ই চাই। ঐ যে বড় বড় মানোয়ারী জাহাজ, ওই যে গোলা-গুলি-

কামান-বন্দুক-গ্যাসের নল, ওই যে উড়ো এবং ডুবো জাহাজ, ও-সমস্তই ওদের সভ্যতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তাই কোনটাই ওদের বোঝা নয়, তাই ওদের পরিণতি, ওদের নিত্য নব আবির্ভাব দেশের প্রতিভার ভিতর থেকেই বিকশিত হয়ে উঠচে। দূর থেকে আমরা লোভ করতেও পারি, নিতান্ত নিরীহ গোছের বাবুয়ানির সরঞ্জাম কিনেও আনতে পারি কিন্তু বাণিজ্যজাহাজই বল, আর মোটরগাড়িই বল, যতক্ষণ না সে নিজেদের প্রয়োজনে, নিজের দেশে, নিজের জিনিসের মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করে, ততক্ষণ যেমন করে এবং যত টাকা দিয়েই না তাদের সংগ্রহ করে আনি, সে আমাদের সত্যকারের ঐশ্বর্য নয়। তাই ম্যানচেস্টারের সূক্ষ্ম বস্ত্র, গ্লাসগো লিনেন এবং মসলিন, স্কট্‌ল্যান্ডের পশমী শীতবস্ত্র,—তা সে আমাদের যত শীতই নিবারণ করুক এবং দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করুক, কোনটাই আমাদের যথার্থ সম্পদ নয়—নিছক আবর্জনা।

কিন্তু আমি একটু সরে গেছি। আমি বলছিলাম যে মানুষ কেবল সত্যকারের প্রয়োজনেই সৃষ্টি করতে পারে এবং সৃষ্টি করা ছাড়া সে কখনো সত্যকারের সম্পদও পায় না। কিন্তু পরের কাছে শিখে মানুষে বড়জোর সেইটুকুই তৈরি করতে পারে, কিন্তু তার বেশি সে সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি করাটা শক্তি, সেটা দেখা যায় না,—এমন কি পশ্চিমের দ্বারস্থ হয়েও না। এই শক্তির আধার নিজের প্রতি বিশ্বাস,—আত্মনির্ভরতা। কিন্তু যে শিক্ষা আমাদের আত্মস্থ হতে দেয় না, অতীতের গৌরব-কাহিনী মুছে দিয়ে আত্মসম্মানে অবিশ্রাম আঘাত করে, কানের কাছে কেবলি শোনাতে থাকে আমাদের পিতা-পিতামহেরা কেবল ভূতের ওঝা আর মন্ত্র-তন্ত্র, দৈবজ্ঞ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, তাঁদের কার্যকারণের সম্বন্ধজ্ঞান বা বিশ্বজগতের অব্যাহত নিয়মের ধারণাও ছিল না—তাই আমদের এ দুর্দশা, তা হলে সে শিক্ষায় যত মজাই থাক, তার সঙ্গে অবাধ কোলাকুলি একটু দেখে শুনে করাই ভাল।

পশ্চিমের সভ্যতার আদর্শে মানুষ মারবার শতকোটি মন্ত্র-তন্ত্র, পরের দেশে তার মুখের গ্রাস অপহরণ করবার ততোধিক কল-কারখানা, এ সমস্তই তার প্রয়োজনে তার নিজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেচে,—কিন্তু ঠিক ঐ-সকল আমাদের দেশের সভ্যতার আদর্শে

প্রয়োজন কিনা আমি জানি না। কিন্তু কবি বলেছেন, এই-সকল মহৎ কার্য করেছে তারা নিশ্চয় কোন একটি সত্যের জোরে। অতএব ওটা আমাদের শেখা চাই, কারণ বিদ্যেটা তাদের সত্য। এবং পরক্ষণেই বলেছেন, কিন্তু শুধু ত বিদ্যা নয়, বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে শয়তানিও আছে, সুতরাং শয়তানির যোগেই ওদের মরণ।

হতেও পারে। কিন্তু যে লোক শুধু মারণ-উচ্চাটন বিদ্যে শিখে মন্ত্র জপতে শুরু করেছে, তার কোন্‌টা সত্য আর কোন্‌টা শয়তানি নির্ণয় করা কঠিন। কবি আমাদের মুখে একটা কথা গুঁজে দিয়ে বলেছেন :

"ঐ কথাটাই ত আমরা বার বার বলচি। ভেদবুদ্ধিটা যাদের (অর্থাৎ পশ্চিমের) এত উগ্র, বিশ্বটাকে তাল পাকিয়ে এক-এক গ্রাসে গেলবার জন্যে যাদের লোভ এতবড় হাঁ করেচে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোন কারবার চলতে পারে না, কেননা ওরা আধ্যাত্মিক নয়, আমরা আধ্যাত্মিক। ওরা অবিদ্যাকেই মানে, আমরা বিদ্যাকে; এমন অবস্থায় ওদের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা বিশেষমত পরিহার করা চাই।"

এমন কথা যদি কেউ বলেও থাকে ত খুব বেশি অন্যায় করেছে আমার মনে হয় না। Physics, Chemistry হিন্দু কি ম্লেচ্ছ এ কথা কেউ বলে না। বিদ্যার জাত নেই এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলে culture জিনিসটারও জাত নেই এ কথা কিছুতেই সত্য নয়। এবং ওদের শিক্ষা যদি কেউ বিষের মত পরিহারের ব্যবস্থাই দিয়ে থাকে, ত সে কেবল এই জন্যেই, বিদ্যার জন্যে নয়। আর এই যদি ঠিক হয় যে, তারা কেবল অবিদ্যাকেই মানে এবং আমরা মানি বিদ্যাকে, তা হলে এ দুটোর সমন্বয়ের উপায় বইয়ের মধ্যে, প্রবন্ধের মধ্যে শ্লোক তুলে তুলে হতেও পারে, কিন্তু একটাকে আর একটার গিলে না খেয়ে বাস্তব জগতে যে কিভাবে সমন্বয় হতে পারে আমি জানিনে। যাদের গেলবার মত বড় হাঁ আছে তারা গিলবেই—মনু বা উপনিষদের দোহাই মানবে না। অন্ততঃ এতকাল যে মানেনি সে ঠিক।

পশ্চিমের এতবড় লঙ্কাকাণ্ডের পরেও যে আজ সেই ল্যাজটার ওপরে মোড়কে মোড়কে সন্ধিপত্রের স্নেহসিক্ত কাগজ জড়ান চলছে, এবং এত মারের পরেও যে তার নাড়ী বেশ তাজা আছে তাতে আশ্চর্য হবার আছে কি? এই মহাযুদ্ধ যারা যথার্থ বাধিয়েছিল তাদের দুপক্ষই চমৎকার সুস্থ দেহে ও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। যারা মরবার তারা মরেছে। এবং ফের যদি আবশ্যক হয় তাদেরই আবার মরবার জন্যে জড়ো করা হবে।

সুতরাং এদের মধ্যে আজ যদি কেউ শোকাকুল-চিত্তে কবিকে প্রশ্ন করে থাকে, 'ভারতের বাণী কৈ?' তা হলে সন্দেহ হয় তারা কিঞ্চিৎ রসিকতা করছে! এবং এই জন্যেই তাদের নিমন্ত্রণ করে ঘরে ডেকে এনে নিভৃতে 'মা গৃধঃ' মন্ত্র দিয়ে বশ করা যাবে,—এ ভরসা কবির থাকলেও আমার নেই। কারণ বাঘের কানে 'বিষ্ণু-মন্ত্র' ফুঁকলে বৈষ্ণব হয় কি না আমি ভেবে পাইনে।

আরও একটা কথা। পশ্চিমের সভ্যতার একটা মস্ত মূলমন্ত্র হচ্চে standard of living বড় করা। আমাদের দেশের মূল নীতির সঙ্গে এর পার্থক্য আলোচনা করবার স্থান আমার নেই কিন্তু ওদের সমাজ-নীতির যেমন interpretationই দেওয়া যাক তার আসল কথা হচ্ছে ধনী হওয়ার। ওদের সামাজিক ব্যবস্থা, ওদের সভ্যতা, ওদের ধনবিজ্ঞান—এর সঙ্গে যার সামান্য পরিচয়ও আছে, এ সত্য সে অস্বীকার করবে না। এ ধনী হওয়ার অর্থ ত কেবল সংগ্রহ করাই নয়! সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীকেও তেমনি ধনহীন করে তোলাও এর অন্য উদ্দেশ্য। নইলে, শুধু নিজে ধনী হওয়ার কোন মানেই থাকে না! সুতরাং কোন একটা সমস্ত মহাদেশ যদি কেবল ধনী হতেই চায় ত অন্যান্য দেশগুলোকে সে ঠিক সেই পরিমাণে দরিদ্র না করেই পারে না। তবু এই একটা কথা নিত্য নিয়ত মনে রাখলে দুরূহ সমস্যার আপনি মীমাংসা হয়ে যায়। এই তার মেদ-মজ্জাগত সংস্কার, এই তার সমস্ত সভ্যতার ভিত্তি, এর পরেই তার বিরাট সৌধ অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে। এরই জন্যে তার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত সাধনা নিয়োজিত। আজ আমার কথায়, আমাদের ঋষিবাক্যে সে কি তার সমস্ত civilisation-এর কেন্দ্র নড়িয়ে দেবে? আমাদের সংসর্গে তার বহু যুগ কেটে গেল, কিন্তু আমাদের সভ্যতার আঁচটুকু পর্যন্ত সে কখনো তার গায়ে লাগতে দেয়নি।

আপনাকে এমনি সতর্ক, এমনি স্বতন্ত্র, এমনি শুচি করে রেখেছে যে কোনদিন এর ছায়াটুকু মাড়ায় নি। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে এ দেশের রাজার মাথার কোহিনূর থেকে পাতালের তলে কয়লা পর্যন্ত, যেখানে যা-কিছু আছে, কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় নি। এটা বোঝা যায়, কারণ, এই তার সত্য, এই তার সভ্যতার মূল-শিকড়। এই দিয়েই সে তার সমাজ-দেহের সমস্ত সভ্যতার রস শোষণ করে, কিন্তু আজ খামকা যদি সে ভারতের আধিভৌতিক সত্যবস্তুর বদলে ভারতের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-পদার্থের inquiry করে থাকে ত আনন্দ করব কি হুঁশিয়ার হব—চিন্তার কথা।

ইউরোপ ও ভারতের শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে,—এই মূলে। আমাদের ঋষিবাক্য যত ভালই হোক তারা নেবে না, কারণ তাতে তাদের প্রয়োজন নেই। সে তাদের সভ্যতার বিরোধী। আর তাদের শিক্ষা তারা আমাদের দেবে না—কথাটা শুনতে খারাপ কিন্তু সত্য। আর দিলেও তার যেটুকু ভিক্ষা সেটুকু না নেওয়াই ভাল। বাকীটুকু যদি আমাদের সভ্যতার অনুকূল না হয়, সে শুধু ব্যর্থ নয়, আবর্জনা। তাদের মত পরকে মারতে যদি না চাই, পরের মুখের অন্ন কেড়ে খাওয়াটাই যদি সভ্যতার শেষ না মনে করি ত মারণমন্ত্র যত সত্যই হোক তার প্রতি নির্লোভ হওয়াই ভাল।

আর একটা কথা বলেই আমি এবার এ প্রবন্ধ শেষ কোরব। সময়ের অভাবে অনেক বিষয়ই বলা হোল না,—কিন্তু এই অবান্তর কথাটা না বলেও থাকতে পারলাম না যে, বিদ্যা এবং বিদ্যালয় এক বস্তু নয়; শিক্ষা ও শিক্ষার প্রণালী এ-দুটো আলাদা জিনিস। সুতরাং কোন একটা ত্যাগ করাই অপরটা বর্জন করা নয়। এমনও হতে পারে বিদ্যালয় ছাড়াই বিদ্যালাভের বড় পথ। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা উলটো মনে হলেও সত্য হওয়া অসম্ভব নয়। তেলে জলে মেশে না, এ দুটো পদার্থও একেবারে উলটো, তবু তেলের সেজ জ্বালাতে যে মানুষ জল ঢালে সে কেবল তেলটাকেই নিঃশেষে পুড়িয়ে নিতে। যারা এ তত্ত্ব জানে না তাদের একটু ধৈর্য থাকা ভাল।

স্মৃতিকথা

মনে হয়, পরাধীন দেশের সব চেয়ে বড় অভিশাপ এই যে, মুক্তিসংগ্রামে বিদেশীয়ের অপেক্ষা দেশের লোকের সঙ্গেই মানুষকে বেশি লড়াই করিতে হয়। এই লড়াইয়ের প্রয়োজন যেদিন শেষ হয়, শৃঙ্খল আপনি খসিয়া পড়ে। কিন্তু প্রয়োজন শেষ হইল না, দেশবন্ধু দেহত্যাগ করিলেন। ঘরে-বাহিরে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করার গুরুভার তাঁহার আহত, একান্ত পরিশ্রান্ত দেহ আর বহিতে পারিল না।

আজ চারিদিকে কান্নার রোল উঠিয়াছে, ঠিক এতবড় কান্নারই প্রয়োজন ছিল।

তাঁহার আয়ুষ্কাল যে দ্রুত শেষ হইয়া আসিতেছে, তাহা আমরাও জানিতাম, তিনি নিজেও জানিতেন। সেদিন পাটনায় যাইবার পূর্বে আমায় ডাকাইয়া পাঠাইলেন। শয্যাগত; আমি কাছে গিয়া বসিতে বলিলেন, এবার final শরৎবাবু।

বলিলাম, আপনি যে স্বরাজ চোখে দেখিয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন?

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, তার আর সময় হইল না (১৩২৮ সালে ‘গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনে’ পঠিত)।

তিনি যখন জেলে, তখন জন-কয়েক লোক প্রাচীরের গায়ে নমস্কার করিতেছিল। জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিয়াছিল, আমাদের দেশবন্ধু এই জেলের মধ্যে, তাঁহাকে চোখে দেখিবার জো নাই, আমরা তাই জেলের পাঁচিলে তাঁকে প্রণাম করিতেছি। এ কথা তিনি শুনিয়াছিলেন, আমি তাহাই স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলাম, এরা আপনাকে ছাড়িয়া দিবে কেন? দুই চোখ তাঁহার ছলছল করিয়া আসিল, কয়েক মুহূর্ত তিনি আপনাকে সামলাইয়া লইয়া অন্য কথা পাড়িলেন। মিনিট-কুড়ি পরে ডাক্তার দাসগুপ্ত ঘরের কোণ হইতে আমার

মোটা লাঠিটা আনিয়া আমার হাতে দিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন, ইঙ্গিতটা বুঝেছেন শরৎবাবু? এরা আমাদের একটুখানি গল্প করতেও দিতে চায় না।

এ গল্পের আর আমাদের অবসর মিলিল না।

লোক বলিতেছে, এত বড় দাতা, এত বড় ত্যাগী দেখি নাই। দান হাত পাতিয়া লওয়া যায়, ত্যাগ চোখে দেখা যায়, ইহা সহজে কাহারও দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু হৃদয়ের নিগূঢ় বৈরাগ্য? বাস্তবিক, সর্বপ্রকার কর্মের মধ্যেও এতবড় বৈরাগী আর আমি দেখি নাই। ঐশ্বর্যে যাহার প্রয়োজন ছিল না, ধন-সম্পদের মূল্য যে কোনমতেই উপলব্ধি করিতে পারিল না, সে টাকাকড়ি দুই হাতে ছড়াইয়া ফেলিবে না ত ফেলিবে কে? একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, লোক ভাবে, আমি ব্যক্তিবিশেষের প্রভাবে পড়িয়া ঝোঁকের মাথায় প্র্যাকটিস্ ছাড়িয়াছি। তাহারা জানে না যে, এ আমার বহুদিনের একান্ত বাসনা, শুধু ত্যাগের ছল করিয়াই ত্যাগ করিয়াছি। ইচ্ছা ছিল, সামান্য কিছু টাকা হাতে রাখিব, কিন্তু এ যখন ভগবানের ইচ্ছা নহে, তখন এই আমার ভাল।

কিন্তু এই বিরাট ত্যাগের নিভৃত অন্তরালে আর একজন আছেন—তিনি বাসন্তী দেবী। একদিন ঊর্মিলা দেবী আমাকে বলিয়াছিলেন, দাদার এতবড় কাজের মধ্যে আর একজনের হাত নিঃশব্দে কাজ করে; সে আমাদের বৌ। নইলে দাদা কতখানি কি করতে পারতেন, আমার ভারী সন্দেহ হয়। বাস্তবিক, নন-কো-অপারেশনের প্রথম হইতে ত অনেকই দেখিলাম, কিন্তু সমস্ত কিছুর অগোচরে এমন আড়ম্বরহীন শান্ত দৃঢ়তা, এমন ধৈর্য, এমন সদাপ্রসন্ন স্নিগ্ধ মাধুর্য আর আমার চোখে পড়ে নাই। একান্ত পীড়িত স্বামীকে সেদিন শেষবারের মত কাউন্সিল ঘরে তিনিই পাঠাইয়াছিলেন। ডাক্তারদের ডাকিয়া বলিলেন, গাড়ি হউক, স্ট্রেচার হউক, যা হউক একটা তোমরা বন্দোবস্ত করিয়া দাও। উনি যখন মন স্থির করিয়াছেন, তখন পৃথিবীতে কোন শক্তি নাই ওঁকে আটকায়। হাঁটিয়া যাইবার চেষ্টা করিবেন, তার ফলে তোমরা রাস্তার মাঝখানেই ওঁকে হারাইবে।

অথচ নিজে সঙ্গে যাইতে পারেন নাই, পথের দিকে চাহিয়া সারাদিন চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। ইংরেজীতে যাহাকে বলে scene create করা, এই ছিল তাঁহার সবচেয়ে বড় ভয়। সর্বলোকের চক্ষু তাঁহাতে আকৃষ্ট হওয়ার কল্পনামাত্রেই তিনি সঙ্কুচিত হইয়া উঠেন। আজ এইটিই হইতেছে ভারতের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। গৃহে গৃহে যত দিন না এমনই সাধ্বী, এমনই লক্ষ্মী জন্মগ্রহণ করিবে, ততদিন দেশের মুক্তির আশা সুদূরপরাহত।

আজ চিত্তরঞ্জনের দীপ্তিতে বাঙ্গালার আকাশ ভাস্কর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দীপের যে অংশটা শিখা হইয়া লোকের চোখে পড়ে, তাহার জ্বলার ব্যাপারে কেবল সেইটুকুই তাহার সমস্ত ইতিহাস নহে। তাই মনে হয়, সন্ন্যাসী চিত্তরঞ্জনকে রিক্ত করিয়া লইতেও ভগবান যেমন দ্বিধা করেন নাই, যখন দিয়াছিলেন, তখন কৃপণতাও তেমনই করেন নাই।

অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মিটিং উপলক্ষে কোথাও দূর-পাল্লায় যাইবার প্রয়োজন হইলেই আমার কেমন দুর্ভাগ্য, ঠিক পূর্বক্ষণেই আমার কিছু-না-কিছু একটা মস্ত অসুখ করিত। সেবার দিল্লী যাইবার আগের দিন দেশবন্ধু আমাকে ডাকিয়া কহিলেন, কাল আপনার সঙ্গে ঊর্মিলা যাবেন।

আমি বলিলাম, যে আজ্ঞা, তাই হবে।

দেশবন্ধু কহিলেন, হবে ত বটে, কিন্তু সন্ধ্যার পরে গাড়ি, কাল বিকাল নাগাদ আপনার অসুখ করবে বলে মনে হচ্ছে না ত?

আমি বলিলাম, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে শত্রুপক্ষীয়রা আপনার কাছে আমার দুর্নাম রটনা করেছে।

তিনি কহিলেন, তা করেছে বটে, কিন্তু আপনি বিছানায় শোন, এরূপ সাক্ষ্যপ্রমাণও ত কৈ নেই!

আমার সেই ছেলেটির কথা মনে পড়িল। সে বেচারা বি. এ. পর্যন্ত পড়িয়াও চাকুরি পায় নাই। বড়বাবুর কাছে আবেদন করায় তিনি রাগিয়া বলিয়াছিলেন, যাকে চাকরি দিয়েছি, তার ক্যোয়ালিফিকেশন বেশি, সে বি. এ. ফেল।

প্রত্যুত্তরে ছেলেটি সবিনয়ে নিবেদন করিয়াছিল, আজ্ঞে, একজামিন দিলে কি আমি তার মত ফেল করতেও পারতাম না!

আমিও দেশবন্ধুকে বলিলাম, আমার যোগ্যতা অল্প, তারা আমাকে নিন্দা করে জানি, কিন্তু আমার শুয়ে থাকবার যোগ্যতাও নেই, এ অপবাদ আমি কিছুতেই নিঃশব্দে মেনে নিতে পারব না।

দেশবন্ধু সহাস্যে কহিলেন, না, আপনি রাগ করবেন না, আপনার সে যোগ্যতা তারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে।

গয়া কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া আভ্যন্তরিক মতভেদ ও মনোমালিন্যে যখন চারিদিক আমাদের মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, এই বাঙ্গালাদেশে ইংরাজী বাঙ্গালা যতগুলি সংবাদপত্র আছে, প্রায় সকলেই কণ্ঠ মিলাইয়া সমস্বরে তাঁহার স্তবগান শুরু করিয়া দিল, তখন একাকী তাঁহাকে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যেমন করিয়া যুদ্ধ করিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি, জগতের ইতিহাসে বোধ করি, তাহার আর তুলনা নাই। একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সংসারে কোন বিরুদ্ধ অবস্থাই কি আপনাকে দমাইতে পারে না? দেশবন্ধু একটুখানি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, তা হলে কি আর রক্ষা ছিল? পরাধীনতার যে আগুন এই বুকের মাঝে অহর্নিশি জ্বলছে, সে ত এক মুহূর্তে আমাকে ভস্মসাৎ করে দিত।

লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই, অতি ছোট যাহারা, তাহারাও গালিগালাজ না করিয়া কথা কহে না, দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা! অর্থাভাবে আমরা অতিশয় অস্থির হইয়া উঠিতাম, শুধু অস্থির হইতেন না তিনি নিজে। একটা দিনের কথা মনে পড়ে।

রাত্রি তখন নয়টাই হইবে কি দশটা হইবে, বাহিরে জল পড়িতেছে, আর আমি, সুভাষ ও তিনি শিয়ালদহের কাছে এক বড়লোকের বৈঠকখানায় বসিয়া আছি কিছু টাকার আশায়। আমি অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিলাম, গরজ কি একা আপনারই? দেশের লোক সাহায্য করতে যদি এতটাই বিমুখ হয়ে উঠে ত তবে থাক।

মন্তব্য শুনিয়া বোধ হয় দেশবন্ধু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন। বলিলেন, এ ঠিক নয় শরৎবাবু। দোষ আমাদেরই, আমরাই কাজ করতে জানিনে, আমরাই তাদের কাছে আমাদের কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারিনে। বাঙ্গালী ভাবুকের জাত, বাঙ্গালী কৃপণ নয়। একদিন যখন সে বুঝবে, তার যথাসর্বস্ব এনে আমাদের হাতে ঢেলে দেবে। এই-সকল কথা বলিতে গেলেই উত্তেজনায় তাঁহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিত। এই বাঙ্গালাদেশ ও এই বাঙ্গালাদেশের মানুষকে তিনি কি ভালই বাসিতেন, কি বিশ্বাসই করিতেন! কিছুতেই যেন আর তাহাদের ত্রুটি খুঁজিয়া পাইতেন না।

এ কথার আর উত্তর কি, আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু আজ মনে হয়, বাস্তবিক এতখানি ভাল না বাসিলে এই অপরিসীম শক্তিই বা তিনি পাইতেন কোথায়? লোক কাঁদিতেছে,—মহতের জন্য দেশের লোক ইতিপূর্বে আরও অনেকবার কাঁদিয়াছে, সে আমি চিনি। কিন্তু এ সে নয়। একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার জনের জন্য মানুষের বুকের মধ্যে যেমন জ্বালা করিতে থাকে, এ সেই। আর আমরা, যাহারা তাঁহার আশেপাশে ছিলাম, আমাদের ভয়ানক দুঃখ জানাইবার ভাষাও নাই, পরের কাছে জানাইতে ভালও লাগে না। আমাদের অনেকেরই মন হইতে দেশের কাজ করার ধারণাটা যেন ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আমরা করিতাম দেশবন্ধুর কাজ। আজ তিনি নাই, তাই থাকিয়া থাকিয়া এই কথাই মনে হইতেছে, কি হইবে আর কাজ করিয়া? তাঁহার সব আদেশই কি আমাদের মনঃপূত হইত? হায় রে, রাগ করিবার, অভিমান করিবার জায়গাও আমাদের ঘুচিয়া গেছে! যেখানে এবং যাহাকে বিশ্বাস করিতেন, সে বিশ্বাসের আর সীমা ছিল না। যেন একেবারে অন্ধ। ইহার জন্য আমাদের অনেক ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সহস্র প্রমাণ প্রয়োগেও এ বিশ্বাস টলাইবার জো ছিল না।

সেদিন বরিশালের পথে, স্টিমারে, ঘরের মধ্যে আলো নিবানো, আমি মনে করিয়াছিলাম, পাশের বিছানায় দেশবন্ধু ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, অনেক রাত্রিতে হঠাৎ ডাকিয়া বলিলেন, শরৎবাবু, ঘুমাইয়াছেন?

বলিলাম, না।

তবে চলুন, ডেকে গিয়ে বসিগে।

বলিলাম, ভয়ানক পোকার উৎপাত।

দেশবন্ধু হাসিয়া বলিলেন, বিছানায় শুয়ে ছটফট করার চেয়ে সে ঢের সুসহ। চলুন।

দুইজনে ডেকে আসিয়া বসিলাম। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে তারা দেখা যায়, নদীর অসংখ্য বাঁকা পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া স্টিমার চলিয়াছে, তাহার দূর-প্রসারী সার্চলাইটের আলো কখনও বা তীরে বাঁধা ক্ষুদ্র নৌকার ছাতে, কখনও বা তরুশিরে, কখনও বা জেলেদের কুটীরের চূড়ায় গিয়া পড়িতেছে। দেশবন্ধু বহুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, শরৎবাবু, নদীমাতৃক কথাটার সত্যকার অর্থ যে কি, এ দেশে যারা না জন্মায়, তারা জানেই না। এ আমাদের চাই-ই চাই।

এ কথার তাৎপর্য বুঝিলাম, কিন্তু চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পরে তিনি একা কত কথাই না বলিয়া গেলেন। আমি নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম। উত্তরের প্রয়োজন ছিল না; কারণ, সে-সকল প্রশ্ন নহে, একটা ভাব। তাঁহার কবিচিত্ত কি হেতু জানি না, উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি চরকা বিশ্বাস করেন?

বলিলাম, আপনি যে বিশ্বাসের ইঙ্গিত করছেন, সে বিশ্বাস করিনে।

কেন করেন না?

বোধ হয় অনেকদিন অনেক চরকা কেটেছি বলেই।

দেশবন্ধু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, এই ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি লোকের পাঁচ কোটি লোকও যদি সুতো কাটে ত ষাট কোটি টাকার সুতো হতে পারে।

বলিলাম, পারে। দশ লক্ষ লোক মিলে একটা বাড়ি তৈরিতে হাত লাগালে দেড় সেকেন্ডে হতে পারে। হয়, আপনি বিশ্বাস করেন?

দেশবন্ধু বলিলেন, এ দুটো একবস্তু নয়। কিন্তু আপনার কথা আমি বুঝেছি,—সেই দশ মণ তেল পোড়ার গল্প। কিন্তু, তবুও আমি, বিশ্বাস করি। আমার ভারী ইচ্ছে হয় যে, চরকা কাটা শিখি, কিন্তু কোনরকম হাতের কাজেই আমার কোন পটুতা নেই।

বলিলাম, ভগবান্ আপনাকে রক্ষা করেছেন।

দেশবন্ধু হাসিলেন; বলিলেন, আপনি হিন্দু-মুসলিম ইউনিটি বিশ্বাস করেন?

বলিলাম, না।

দেশবন্ধু বলিলেন, আপনার মুসলমানপ্রীতি অতি প্রসিদ্ধ।

ভাবিলাম, মানুষের কোন সাধু ইচ্ছাই গোপন থাকিবার জো নাই, খ্যাতি এত বড় কানে আসিয়াও পৌঁছিয়াছে! কিন্তু নিজের প্রশংসা শুনিলে চিরদিনই আমার লজ্জা করে, তাই সবিনয়ে বদন নত করিলাম।

দেশবন্ধু কহিলেন, কিন্তু এ ছাড়া আর কি উপায় আছে বলতে পারেন? এরই মধ্যে তারা সংখ্যায় পঞ্চাশ লক্ষ বেড়ে গেছে, আর দশ বছর পরে কি হবে বলুন ত?

বলিলাম, এটা যদিও ঠিক মুসলমানপ্রীতির নিদর্শন নয়, অর্থাৎ, বছর-দশেক পরের কথা কল্পনা করে আপনার মুখ যেমন সাদা হয়ে উঠেচে, তাতে আমার নিজের সঙ্গে আপনার খুব বেশি তফাত মনে হচ্চে না। তা সে যাই হোক, কেবলমাত্র সংখ্যাই আমার কাছে মস্ত জিনিস নয়। তা হলে চার কোটি ইংরাজ দেড়-শ কোটি লোকের মাথায় পা দিয়ে বেড়াতে পারত না। নমঃশূদ্র, মালো, নট, রাজবংশী, পোদ এদের টেনে নিন, দেশের মধ্যে, দশের মধ্যে এদের একটা মর্যাদার স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়ে এদের মানুষ করে তুলুন, মেয়েদের প্রতি যে অন্যায়, নিষ্ঠুর, সামাজিক অবিচার চলে আসছে, তার প্রতিবিধান করুন, ওদিকের সংখ্যার জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না।

নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতির লাঞ্ছনার কথায় তাঁহার বুকে যেন শেল বিদ্ধ হইতে থাকিত। কে নাকি একবার তাঁহাকে বলিয়াছিল, দেশবন্ধু শব্দের আর একটা অর্থ চণ্ডাল। এই কথায় তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। নিজে উচ্চকুলে জন্মিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, উচ্চজাতির দেওয়া বিনা দোষে এই অপমানের গ্লানি নিপীড়িতদের সহিত সমভাবে ভোগ করিবার জন্য প্রাণ তাঁহার আকুল হইয়া উঠিত। ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আপনারা দয়া করে আমাকে এই পলিটিক্সের বেড়াজাল থেকে উদ্ধার করে দিন, আমি ঐ ওদের মধ্যে গিয়ে থাকিগে। আমি ঢের কাজ করতে পারবো। এই বলিয়া তিনি ইহাদের প্রতি দীর্ঘকাল ধরিয়া হিন্দুসমাজ কত অত্যাচার করিতেছে, তাহাই এক একটা করিয়া বলিতে লাগিলেন।

কহিলেন, বেচারাদের ধোপা-নাপিত নেই, ঘরামীরা ঘর ছেয়ে দেয় না। অথচ এরাই মুসলমান, খ্রীস্টান হয়ে গেলে আবার তারাই এসে এদের কাজ করে। অর্থাৎ হিন্দুরাই প্রকারান্তরে বলছে, হিন্দুর চেয়ে মুসলমান, খ্রীস্টানই বড়। এরকম senseless সমাজ

মরবে না ত মরবে কে? এই বলিয়া বহুক্ষণ স্থির থাকিয়া সহসা প্রশ্ন করিলেন, আপনি আমাদের অহিংস-অসহযোগ বিশ্বাস করেন ত?

বলিলাম, না। অহিং সহিংস কোন অসহযোগেই আমার বিশ্বাস নেই।

দেশবন্ধু সহাস্যে কহিলেন, অর্থাৎ আমাদের মধ্যে দেখছি, কোথাও লেশমাত্র মতভেদ নেই।

আমি প্রত্যুত্তরে কহিলাম, একদিন কিন্তু যথার্থই লেশমাত্র মতভেদ থাকবে না, আমি এই আশাতেই আছি। ইতিমধ্যে যতটুকু শক্তি, আপনার কাজ করে দিই। আর শুধু মত নিয়েই বা হবে কি, বসন্ত মজুমদার, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় এঁরা ত দেশের বড় কর্মী, কিন্তু ইংরাজের প্রতি বসন্তর বিঘূর্ণিত রক্তচক্ষুর অহিংস দৃষ্টিপাত এবং শ্রীশের প্রেমসিক্ত বিদ্বেষবিহীন মেঘগর্জন,—এই দুটি বস্তু দেখলে এবং শুনলে আপনারও সন্দেহ থাকবে না যে, মহাত্মাজীর পরে অহিংস অসহযোগ যদি কোথাও স্থিতি লাভ করে থাকে, ত এই দুটি বন্ধুর চিত্তে। অথচ, এত বেশী কাজই বা কয় জনে করেছে? অসহযোগ আন্দোলনের সার্থকতা ত গণসাধারণ, অর্থাৎ mass-এর জন্য? কিন্তু এই mass পদার্থটির প্রতি আমার অতিরিক্ত শ্রদ্ধা নেই। একদিনের উত্তেজনায় এরা হঠাৎ কিছু একটা করে ফেলতেও পারে, কিন্তু দীর্ঘদিনের সহিষ্ণুতা এদের নেই। সেবার দলে দলে এরা জেলে গিয়েছিল, কিন্তু দলে দলে ক্ষমা চেয়ে ফিরেও এসেছিল। যারা আসেনি, তারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলেরা। তাই আমার সমস্ত আবেদন নিবেদন এদের কাছে। ত্যাগের দ্বারা কেউ কোন দিন যদি দেশ স্বাধীন করতে পারে, ত শুধু এরাই পারবে।

এইখানে দেশবন্ধুর বোধ করি, একটা গোপন ব্যথা ছিল, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু জেলের কথায় তাঁহার আর একটা প্রকাণ্ড ক্ষোভের কথা মনে পড়িয়া গেল। বলিলেন, এ দুরাশা আমার কোনদিন নেই যে, দেশ একেবারে এক লাফে পুরো স্বাধীন হয়ে যাবে। কিন্তু আমি চাই স্বরাজের একটা সত্যকার ভিত্তি স্থাপন করতে। আমি তখন জেলের মধ্যে,

বাইরে বড়লাট প্রভৃতি এঁরা, ওদিকে সবরমতি আশ্রমে মহাত্মাজী,– তাঁর কিছুতেই মত হল না, অতবড় সুযোগ আমাদের নষ্ট হয়ে গেল। আমি বাইরে থাকলে কোনমতেই এতবড় ভুল করতে দিতাম না। অদৃষ্ট! তাঁর লীলা!

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছিল, বলিলাম, শুতে যাবেন না? চলুন।

চলুন, বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, এই রেভোলিউসনারীদের সম্বন্ধে আপনার যথার্থ মতামত কি?

সম্মুখের আকাশ ফরসা হইয়া আসিতেছিল, তিনি রেলিং ধরিয়া কিছুক্ষণ উপরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, এদের অনেককে আমি অত্যন্ত ভালবাসি, কিন্তু এদের কাজ দেশের পক্ষে একেবারে ভয়ানক মারাত্মক। এই অ্যাক্টিভিটিতে সমস্ত দেশ অন্ততঃ পঁচিশ বছর পেছিয়ে যাবে। তা ছাড়া এর মস্ত দোষ এই যে, স্বরাজ পাবার পরেও এ জিনিস যাবে না, তখন আরও স্পর্ধিত হয়ে উঠবে, সামান্য মতভেদে একেবারে 'সিভিল ওয়ার' বেধে যাবে। খুনোখুনি রক্তারক্তি আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি, শরৎবাবু।

কিন্তু এই কথাগুলি তিনি যখনই যতবার বলিয়াছেন, ইংরাজী খবরের কাগজওয়ালারা বিশ্বাস করে নাই, উপহাস করিয়াছে, বিদ্রূপ করিয়াছে। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, রাত্রিশেষের আলো-অন্ধকার আকাশের নীচে, নদীবক্ষে দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখ দিয়া সত্য ছাড়া আর কোন বাক্যই বাহির হয় নাই।

বহুদিন পরে আর একদিন রাত্রিতে তাঁহার মুখ হইতে এমনই অকপট সত্য উক্তি বাহির হইতে আমি শুনিয়াছি। তখন রাত্রি বোধ হয় আটটা বাজিয়া গিয়াছে, আচার্য রায়মহাশয়কে বাড়িতে পৌঁছাইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, দেশবন্ধু সিঁড়ির উপরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বলিলাম, একটা কথা বলব, রাগ করবেন না?

তিনি বলিলেন, না।

আমি বলিলাম, বাঙ্গালাদেশে আপনারা এই যে কয়জন সত্যকার বড়লোক আছেন, তা পরস্পরের সন্দর্শনমাত্রই আপনারা পুলকে যে রকম রোমাঞ্চিতকলেবর হয়ে ওঠেন–

দেশবন্ধু হাসিয়া বলিলেন, বেড়ালের মত?

বলিলাম, পাপমুখে ও আর আমি ব্যক্ত করব কি করে? কিন্তু কিছু একটা না হলে–

দেশবন্ধুর মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, কত যে ক্ষতি হয়, সে আমার চেয়ে বেশি আর কে জানে? কেউ যদি এর পথ করে দিতে পারে, ত আমি সকলের নীচে, সকলের তাঁবে কাজ করতে রাজী আছি। কিন্তু ফাঁকি চলবে না, শরৎবাবু।

সেদিন তাঁহার মুখের উপর অকৃত্রিম উদ্বেগের যে লেখা পড়িয়াছিলাম, সে আর ভুলিবার নহে। বাহির হইতে যাহারা তাঁহাকে যশের কাঙাল বলিয়া প্রচার করে, তাহারা না জানিয়া কত বড় অপরাধই না করে! আর ফাঁকি? বাস্তবিক যে লোক তাঁহার সর্বস্ব দিয়াছে, বিনিময়ে সে ফাঁকি সহিবে কি করিয়া?

আর একটা কথা বলিবার আছে। কথাটা অপ্রীতিকর। সতর্কতা ও অতি-বিজ্ঞতার দিক দিয়া একবার ভাবিয়াছিলাম বলিয়া কাজ নাই, কিন্তু পরে মনে হইয়াছে, তাঁহার স্মৃতির মর্যাদা ও সত্যের জন্য বলাই ভাল। এবার ফরিদপুরে 'কন্‌ফারেন্সে' আমি যাই নাই, তথাকার সমস্ত খুঁটিনাটি আমি জানি না, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া অনেকে আমার কাছে এমন সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে,–যাহা প্রিয় নহে, সাধুও নহে। অধিকাংশই ক্ষোভের ব্যাপার এবং দেশবন্ধুর সম্বন্ধে তাহা একেবারেই অসত্য।

দেশের মধ্যে রেভোলিউসনারী ও গুপ্তসমিতির অস্তিত্বের জন্য কিছুকাল হইতে তিনি নানা দিক দিয়া নিজেকে বিপন্ন জ্ঞান করিতেছিলেন। তাঁহার মুশকিল হইয়াছিল এই যে, স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা বলি স্বরূপে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের একান্তভাবে না ভালবাসাও তাঁহার পক্ষে যেমন অসম্ভব ছিল, তাঁহাদের প্রশ্রয় দেওয়াও তাঁহার পক্ষে তেমনই অসম্ভব ছিল। তাঁহাদের চেষ্টাকে দেশের পক্ষে নিরতিশয় অকল্যাণের হেতু জ্ঞান করিয়া তিনি অত্যন্ত ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সমিতিকে উদ্দেশ করিয়া আমাকে একদিন বাঙ্গালায় একটা appeal লিখিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। আমি লিখিয়া আনিলাম, "যদি তোমরা কোথাও কেহ থাকো, যদি তোমাদের মতবাদ সম্পূর্ণ বর্জন করিতেও না পারো, ত অন্ততঃ পাঁচ-সাত বৎসরের জন্যও তোমাদের কার্যপদ্ধতি স্থগিত রাখিয়া আমাদের প্রকাশ্যে সুস্থচিত্তে কাজ করিতে দাও। ইত্যাদি ইত্যাদি।" কিন্তু আমার 'যদি' কথাটায় তিনি ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিলেন, 'যদি'তে কাজ নেই। সাতাশ বৎসর ধরে ' assuming but not admitting' করে এসেছি, কিন্তু আর ফাঁকি নয়। আমি জানি, তারা আছে, 'যদি' বাদ দিন।

আমি আপত্তি করিয়া বলিলাম, আপনার স্বীকারোক্তির ফল দেশের উপরে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে।

দেশবন্ধু জোর করিয়া বলিলেন, না। সত্য কথা বলার ফল কখনও মন্দ হয় না।

বলা বাহুল্য, আমি রাজী হইতে পারি নাই এবং আবেদনও প্রকাশিত হইতে পারে নাই। আমাকে বলিয়াছিলেন, এ-সকল যারা করে, তারা জেনেশুনেই করে, কিন্তু যারা করে না কিছুই, গভর্নমেন্টের হাতে তারাই বেশি করে দুঃখ পায়। সুভাষ, অনিলবরণ, সত্যেন প্রভৃতির জন্য তাঁহার মনস্তাপের অবধি ছিল না। সুভাষকে করপোরেশনে কাজ দিবার পরে একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, I have sacrificed my best man for this corporation. এবং সেই সুভাষকেই যখন পুলিশ ধরিয়া লইয়া গেল, তখন তাঁহার

দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাঁহাকে সর্বদিক দিয়া অক্ষম ও অকর্মণ্য করিয়া দিবার জন্যই গভর্নমেণ্ট তাঁহার হাত-পা কাটিয়া তাঁহাকে পঙ্গু করিয়া আনিতেছে।

তাঁহার ফরিদপুর অভিভাষণের পরে মডারেটদলের লোক উৎফুল্ল হইয়া বলিতে লাগিল, আর ত কোনও প্রভেদ নাই, আইস, এখন কোলাকুলি করিয়া মিলিয়া যাই। ইংরাজী খবরওয়ালার দল তাঁহার 'জেস্‌চারের' অর্থ এবং অনর্থ করিয়া গালি দিল কি সুখ্যাতি করিল, ঠিক বুঝাই গেল না। তাঁহার নিজের দলের বহুলোক মুখ ভারী করিয়াই রহিল, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার একটা কথা বলিবার আছে।

অসাধারণ কর্মীদের এই একটা বড় দোষ যে, তাঁহারা নিজেদের ভিন্ন অপরের কর্মশক্তির প্রতি আস্থা রাখিতে পারেন না। এবার পীড়ায় যখন শয্যাগত, পরলোকের ডাক বোধ হয় যখন তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, শরৎবাবু, compromise করতে যে শিখলে না, বোধ হয় এ জীবনে সে কিছুই শিখলে না। Tory Government is the cruellest Government in the world. এরা না পারে, পৃথিবীতে এমন অনাচার নেই। আবার মিটমাট করে নেবার পক্ষেও, বোধ করি, এমন বন্ধু আর নেই। কিন্তু ভয় হয়, আমি তখন আর থাকব না। জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি মুহূর্তকালের জন্যও তাঁহার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হয় নাই।

একবার একটা সভার পরে গাড়ির মধ্যে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, অনেকে আমাকে আবার প্র্যাক্‌টিস করে দেশের জন্যে টাকা রোজগার করে দিতে পরামর্শ দেন। আপনি কি বলেন?

আমি বলিলাম, না। টাকার কাজের শেষ আছে, কিন্তু এই আদর্শের আর অন্ত নেই। আপনার ত্যাগ চিরদিন আমাদের জাতীয় সম্পত্তি হয়েই থাক। এ আমাদের অসংখ্য টাকার চেয়েও ঢের বড়। দেশবন্ধু জবাব দিলেন না। হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এই

হাসিটা এবং স্তব্ধতার মূল্য যেন আমরা বুঝিতে পারি,—ইহার চেয়ে বড় কামনা আর নাই।*

অভিনন্দন

শ্রদ্ধাস্পদ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের শ্রীকরকমলেষু–

হে বন্ধু, তোমার স্বদেশবাসী আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। মুক্তিপথযাত্রী যত নর-নারী যে যেখানে যত লাঞ্ছনা, যত দুঃখ, যত নির্যাতন ভোগ করিয়াছে, হে প্রিয়, তোমার মধ্যে আজ আমরা তাহাদের সমস্ত মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া সগৌরবে, সবিনয়ে নমস্কার করি। সুজলা, সুফলা, শ্যামলা মা আমাদের আজ অবমানিতা, শৃঙ্খলিতা। মাতার শৃঙ্খলভার যত সন্তান তাঁহার স্বেচ্ছায় স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে, তুমি তাহাদের অগ্রজ; হে বরেণ্য, তোমার সেই সকল খ্যাত ও অখ্যাত ভ্রাতা ও ভগিনীগণের উদ্দেশে স্বতঃউচ্ছ্বসিত সমস্ত দেশের প্রীতি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি গ্রহণ কর।

একদিন দেশের লোক তোমাকে ক্ষুধিত ও পীড়িতের আশ্রয় বলিয়া জানিয়াছিল, সে দিন সে ভুল করে নাই। কিন্তু যে কথা তুমি নিজে চিরদিন গোপন করিয়াছ,– দাতা ও গ্রহীতার সেই নিভৃত করুণ সম্বন্ধ–আজও সে তেমনই গোপনে শুধু তোমাদের জন্যই থাক। কিন্তু, আর একদিন এই বাঙ্গালাদেশ তোমাকে ভাবুক বলিয়া, কবি বলিয়া বরণ করিয়াছিল, সে দিনও সে ভুল করে নাই। সে দিন এই বাঙ্গালার নিগূঢ় মর্মস্থানটি উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিতে, তাহার একান্ত সঞ্চিত অন্তর-বাণীটি নিরন্তর কান পাতিয়া শুনিতে, তাহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিয়া লইতে তোমার একাগ্র সাধনার অবধি ছিল না। তখন হয়ত তোমার সকল কথা বঙ্গের ঘরে ঘরে গিয়া পৌঁছায় নাই, হয় ত কাহারও রুদ্ধ দ্বারে ঘা খাইয়া সে ফিরিয়াছে, কিন্তু পথ যেখানে তাহার মুক্ত ছিল, সেখানে সে কিছুতেই ব্যর্থ হইতে পায় নাই।

তাহার পরে এক দিন মাতার কঠিনতম আদেশ তোমার প্রতি পৌঁছিল। যে দিন দেশের কাছে স্বাধীনতার সত্যকার মূল্য নির্দেশ করিয়া দিতে সর্বস্ব পণে তোমাকে পথে বাহির হইতে হইল, সে দিন তুমি দ্বিধা কর নাই।

বীর তুমি, দাতা তুমি, কবি তুমি,–তোমার ভয় নাই, তোমার মোহ নাই,– তুমি নির্লোভ, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন। রাজা তোমাকে বাঁধিতে পারে না, স্বার্থ তোমাকে ভুলাইতে পারে না, সংসার তোমার কাছে হার মানিয়াছে। বিশ্বের ভাগ্য-বিধাতা তাই তোমার কাছেই দেশের শ্রেষ্ঠ বলি গ্রহণ করিলেন, তোমাকেই সর্বলোক-চক্ষুর সাক্ষাতে দেশের স্বাধীনতার (১৩৩২ আষাঢ় 'দেশবন্ধু স্মৃতিসংখ্যা' মাসিক 'বসুমতী' গৃহীত।) মূল্য সপ্রমাণ করিয়া দিতে হইল। যে কথা তুমি বার বার বলিয়াছ–স্বাধীনতার জন্য বুকের জ্বালা কি, তাহা তোমাকেই সকল সংশয়ের অতীত করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইল। বুঝাইয়া দিতে হইল,– "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

এই ত তোমার ব্যথা! এই ত তোমার দান!

ছলনা তুমি জান না, মিথ্যা তুমি বল না, নিজের তরে কোথাও কিছু লুকাইতে তুমি পার না–তাই, বাঙ্গালা তোমাকে যখন 'বন্ধু' বলিয়া আলিঙ্গন করিল, তখন সে ভুল করিল না, তাহার নিঃসঙ্কোচ নির্ভরতায় কোথাও লেশমাত্র দাগ লাগিল না।

আপনার বলিয়া, স্বার্থ বলিয়া কিছু তোমার নাই, সমস্ত স্বদেশ, তাই ত, আজ তোমার করতলে। তাই ত, তোমার ত্যাগ আজ শুধু তোমার নয়, আমাদের। শুধু বাঙ্গালীকে নয়, তোমার প্রায়শ্চিত্ত আজ বিহারী, পাঞ্জাবী, মারহাট্টি, গুজরাটী যে যেখানে আছে, সকলকে নিষ্পাপ করিয়াছে।

তোমার দান আমাদের জাতীয় সম্পত্তি,– এ ঐশ্বর্য বিশ্বের ভাণ্ডারে আজ সমস্ত মানবজাতির জন্য অক্ষয় হইয়া রহিল। এমনই করিয়াই মানব-জীবনের দেনা-পাওনার পরিশোধ হয়, এমনিই করিয়াই যুগে যুগে মানবাত্মা পশুশক্তি অতিক্রম করিয়া চলে।

একদিন নশ্বর দেহ তোমার পঞ্চভূতে মিলাইবে। কিন্তু যত দিন সংসারে অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের, সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের, অধীনতার বিরুদ্ধে মুক্তির বিরোধ শান্ত হইয়া না আসিবে, তত দিন অবমানিত, উপদ্রুত মানবজাতির সর্বদেশে, সর্বকালে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমার এই সুকঠোর প্রতিবাদ মাথায় করিয়া বহিবে এবং কোনমতে কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকাটা যে অনুক্ষণ শুধু বাঁচাকেই ধিক্কার দেওয়া, এ সত্য কোন দিন বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

জীবনতত্ত্বের এই অমোঘ বাণী স্বদেশে বিদেশে, দিকে দিকে উদ্ভাসিত করিবার গুরুভার বিধাতা স্বহস্তে যাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার কারাবসানের তুচ্ছতাকে উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়া আমরা উল্লাস করিতে আসি নাই। হে চিত্তরঞ্জন, তুমি আমাদের ভাই, তুমি আমাদের সুহৃদ্, তুমি আমাদের প্রিয়,– অনেক দিন পরে তোমাকে কাছে পাইয়াছি। তোমার সকল গর্বের বড় গর্ব–বাঙ্গালী তুমি; তাই ত সমস্ত বাঙ্গালার হৃদয় তোমার কাছে আজ বহিয়া আনিয়াছে,– আর আনিয়াছি, বঙ্গজননীর একান্ত মনের আশীর্বাদ,– তুমি চিরজীবী হও!

তুমি জয়যুক্ত হও!

তোমার গুণ-মুগ্ধ–স্বদেশবাসিগণ

———-

[১৯২২ সালের ২০শে আগস্ট, দেশবন্ধুর কারামুক্তির পর, মির্জাপুর পার্কে (শ্রদ্ধানন্দ পার্কে) দেশবাসীর পক্ষ হইতে পঠিত অভিনন্দন।]

সাহিত্য

ভবিষ্যৎ বঙ্গ-সাহিত্য

আমি বক্তা নই।কিছু বলতে আমি আদপেই পারিনে। ঘরে বসে কাগজ কলম নিয়ে লেখা এক ব্যাপার, আর বাইরে দাঁড়িয়ে বলা আর এক ব্যাপার। আপনারা আমার বই পড়ে সবাই প্রশংসা কচ্ছেন, অথচ কিছুদিন থেকে লেখা আমি একমত ছেড়ে দিয়েছি। সাহিত্য সেবাকেই জীবনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা বলে মনে করতে পারচি নে। আমার নিজের কথা ছাড়াও সমস্ত দেশের সাহিত্যে কত অসত্য, কত পঙ্গুতা এসে পড়েছে। সমাজের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে তার ভিতরের বাসনা কামনার আভাস দেওয়াই সাহিত্য। ভাবে, কাজে, চিন্তায় মুক্তি এনে দেওয়াই ত সাহিত্যের কাজ। সাহিত্য যদি বাস্তবিক মুক্তির ব্যাপার হয়, তবে আমাদের সাহিত্য একেবারেই পঙ্গু। আমাদের সাহিত্যে নতুন জিনিস দেবার জো নেই। ইউরোপের কথা ধরুন। ওদের Church আছে, Navy আছে, Army আছে। ওদের অবাধ মেলামেশা আছে, আনন্দ আছে। আমাদের এদিক যাবার জো নেই, ওদিক যাবার জো নেই, কোনদিকে একটু নড়চড় হয়েছে কি সব গোলমাল হয়ে যাবে! তারই মধ্যে যে একটু-আধটু পারে সে আমাদের নিত্যকার বৈচিত্র্যহীন সংসার ও সমাজের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

সাহিত্যে স্বাধীনতার মানে অরাজকতা, anarchy নয়। এখানে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে কারুর মনে ভয় জাগিয়ে তুলতে আমি চাইনে, কিন্তু দেখি কথা হয় যেন সব লুকিয়ে লুকিয়ে, ভয়ে ভয়ে। 'সিডিশন' (sedition) বাঁচিয়ে এখানে মুক্তির কথা বলা হয়। তাই আমার মনে হয়, বড় সাহিত্যিক আমাদের দেশে এখন আর জন্মাবে না। রাজনীতিতে, ধর্মে, সামাজিক আচার-ব্যবহারে যেদিন আমাদের হাত-বাঁধা, পা-গুটানো আর থাকবে না, যে দিন আনন্দের ভিতর দিয়ে লিখতে পারা যাবে, সেই দিন আবার সাহিত্যসৃষ্টির দিন ফিরে আসবে।" (১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বরিশাল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ শাখার অভিনন্দনের উত্তরে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।)

গুরু-শিষ্য সংবাদ

শিষ্য। প্রভু, আত্মা কি? ঈশ্বরই বা কি, এবং কি করিয়াই বা তাহা জানা যায়?

গুরু। বৎস, এ বড় কঠিন প্রশ্ন। সকলে জানে না, কিন্তু আমি জানি। বিস্তর সাধনায় তবেই তাঁকে পাওয়া যায়, যেমন আমি পাইয়াছি।

অবধান কর, আমার মুখ হইতে শুনিলেই তুমি জলের মত বুঝিতে পারিবে। (শিষ্যের হাঁ করিয়া থাকা)

গুরু। (গম্ভীর হইয়া) বৎস, শাস্ত্র বলিয়াছেন, "রসো বৈ সঃ" অর্থাৎ কিনা তিনি—রস। এই রসের দ্বারাই তিনি এক এবং বহু। এই বহুকে পূত রসের দ্বারা উদ্বোধন করিয়া, একের মধ্যে বহু ও ঐক্যের মধ্যে অনৈক্যকে উপলব্ধি করিবে। ভারতবর্ষের ইহাই চিরন্তন সাধনা। আচ্ছা, তাহা হইলে তোমার কি হইবে, না, ভূমানন্দ লাভ হইবে— যেমন আমার হইয়াছে। তখন সেই ভূমানন্দকে, একের দ্বারা, বহুর দ্বারা, ঐক্যের দ্বারা এবং অনৈক্যের দ্বারা, ত্যাগের ভিতর দিয়া পাইলেই তোমার ত্যাগানন্দ লাভ হইবে। বৎস, সেই ত্যাগানন্দের চিত্রকে বিচিত্র করিয়া হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিলেই তোমার ঈশ্বর পাওয়া হইল। এ বোঝা আর শক্ত কি বৎস?

শিষ্য। আজ্ঞা,—আজ্ঞা না। তেমন শক্ত নয়। আচ্ছা গুরুদেব, ভূমানন্দই বা কি, আর ত্যাগানন্দই বা কি?

গুরু। বুঝাইয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। পরব্রহ্মই ভূমা। তাঁর আনন্দের নামই ভূমানন্দ। এ আনন্দের তুলনা নাই, কিন্তু বড় কঠোর সাধনার আবশ্যক। ভূমা অন্ত-বিশিষ্ট অনন্ত, আকার-বিশিষ্ট নিরাকার—অর্থাৎ নিরাকার কিন্তু সাকার, যেমন কালো কিন্তু সাদা,—বুঝিলে?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ—যেমন কালো কিন্তু সাদা।

গুরু। ঠিক তাই। চোখ বুজিয়া অনুভব করিয়া লও, যেন কালো কিন্তু সাদা। এই যে, এই যে তাঁর পূর্ণরূপ। এই যে তাঁর সত্যরূপ, এই সত্যরূপকে হৃদয়ে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া, একাগ্র চিত্তে বিশ্ববাণীর পবিত্র অর্ঘ্য দিয়া শতদল পদ্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইবে। বৎস, এমন হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিও না—সাধনা করিলেই পারিবে।

শিষ্য। আজ্ঞা!

গুরু। হাঁ, না হইলে আমিই বা ভূমানন্দে এমন বিভোর হইয়া থাকিতে পারিতাম কি করিয়া? আচ্ছা, এখন সেই সৎস্বরূপকেই শ্রদ্ধায় নিষ্ঠায় একীভূত করিয়া, সত্যের দ্বারা আবাহন করিয়া লইলেই তোমার হৃদয়ে বিশ্বমানবতার যে বিপুল স্পন্দন জাগ্রত হইয়া উঠিবে, সেই অনুভূতির নামই ভূমানন্দ, বৎস।

শিষ্য। বুঝিয়াছি গুরুদেব, এমন কঠিন বস্তু আপনি কত সহজে এবং কি সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিলেন! ভূমানন্দ সম্বন্ধে আর আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

গুরু। (মৃদু মৃদু হাস্য। তদনন্তর চক্ষু বুজিয়া) বৎস, সমস্তই ভগবৎ প্রসাদাৎ। নিজে বুঝিয়াছি, তাঁহার সত্যরূপ এই হৃদয়ে সম্যক্ অনুভব করিয়া ধন্য হইয়াছি বলিয়াই এত শীঘ্র তোমাকে এমন জলের মত বুঝাইয়া দিলাম। এখন তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, অবহিত হও। কি প্রশ্ন করিয়াছিলে? ত্যাগানন্দ কি? এটিও আনন্দ-স্বরূপ বৎস। পাইলেই আমাদের আনন্দ হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু সেই পাওয়া যেমন-তেমন করিয়া পাইলেই ত চলিবে না। সে পাওয়া নিষ্ফল পাওয়া, সে পাওয়া পাওয়াই নয়,—অতএব ত্যাগের দ্বারা পাইবার চেষ্টা করিবে।

শিষ্য। প্রভু, ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। ত্যাগের দ্বারা কি করিয়া পাইব? ত্যাগ করিলেই ত হাতছাড়া হইয়া যাইবে।

গুরু। বৎস, ভুল বুঝিতেছ। তোমাকে ত্যাগ করিতে বলিতেছি না, ত্যাগের দ্বারা পাইতে বলিতেছি। অর্থাৎ পাঁচ জনে ত্যাগ করিতে থাকিলে সম্ভবতঃ তোমার যে প্রাপ্তি ঘটিবে, সেই যে ত্যাগের পাওয়া, সেই যে বড় দুঃখের পাওয়া, তাহাকে বিশ্বপতির দান বলিয়া হৃদয়ে সাত্ত্বিকভাবে বরণ করিয়া লইলেই তোমার ত্যাগানন্দ জন্মিবে। আহা, সে কি আনন্দ রে! (ক্ষণকাল মুদিত চক্ষে মৌন থাকিয়া পুনরায়) বৎস, আমার এই যে 'আমি'টা,—শাস্ত্র যাকে 'অহং' বলে, 'অহমিকা' বলে, ত্যাগ করতঃ পরিবর্জন করিতে আদেশ দিয়াছেন, আমার সেই 'আমি'টার মত সর্বনেশে বস্তু সংসারে নাই। এই 'আমি'টাকে পাঁচ জনের মধ্যে, বিশ্বমানবের মধ্যে ডুবাইয়া দিবে।

তখন, তোমার আর আত্ম-পর ভেদ থাকিবে না, পাঁচ জনকে আর আলাদা করিয়া দেখিবে না। তখন, তাহাদের দানকেই নিজের দান বলিয়া উপলব্ধি করিয়া হৃদয়ে যে অতুল আনন্দ উপভোগ করিবে, বৎস, ভগবানের সেই আনন্দরূপকে অন্তরে ধারণ করিয়া আমি চিরদিনের মত ধন্য হইয়া গিয়াছি। আহা!

শিষ্য। বুঝিলাম গুরুদেব। এইবার আশীর্বাদ করুন, বর দিন, যেন, কঠোর সাধনার দ্বারা আপনার শিষ্য হইবার যোগ্য হইতে পারি।

গুরু। তথাস্তু। (যমুনা, ১৩২০ ফাল্গুন, ৫ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা হইতে গৃহীত।)

সাহিত্য ও নীতি

শিশুকাল থেকেই কৃষ্ণনগর নামটি আমার কাছে পরিচিত, এবং সে পরিচয় ঘটেছিল আমার পিতামহীর মুখের নানা বিচিত্র গল্প ও ছড়ার মধ্য দিয়ে। সাহিত্য-রসের সেই মধুর আস্বাদ এই প্রাচীন বয়সেও আমি ভুলি নাই। এই জনপদই যে একদিন শিল্প-কলা ও সাহিত্যের কেন্দ্র ছিল, আমি নিশ্চয় জানি, এ কথা বললে অতিশয়োক্তির অপরাধ হয় না। বাঙ্গালার মস্ত বড় দু'জন কবি,—একজনের কর্মভূমি, ও অন্যজনের জন্মভূমি এই কৃষ্ণনগর! বঙ্গদেশের নানা সুখ-দুঃখের ইতিহাসে এই প্রাচীন নগর একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ইহাকে চোখে দেখবার লোভ মনে মনে আমার চিরদিন ছিল। আজ সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ থেকে আপনাদের সাদর আহ্বানে সে সাধ আমার পূর্ণ হলো। আপনারা আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

সাহিত্য সেবাই আমার পেশা, কিন্তু ইহার যাচাই-বাছাই ঘষা-মাজার ব্যাপারে আমি নিতান্তই অনভিজ্ঞ, এ কথা আমার মুখে অদ্ভুত শুনালেও ইহা বাস্তবিক সত্য। কোন্ ধাতুর উত্তর কি প্রত্যয় করে সাহিত্য-পদ নিষ্পন্ন হয়েছে, কোথায় ইহার বিশেষত্ব, রস বস্তুটি কি, কাকে বলে সত্যকার আর্ট, কাকে বলে মিথ্যাকার আর্ট, কি ইহার সংজ্ঞা, আমি কিছুই এ সকলের জানি না। সুদূর প্রবাসে কেরানিগিরি করতাম, ঘটনাচক্রে বছর-দশেক হলো এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে পড়েছি। খান-কয়েক বই লিখেছি, কারও ভাল লেগেছে, অনেকেরই লাগেনি,—পণ্ডিত যাঁরা, তাঁরা ভারী ভারী কেতাব থেকে শক্ত শক্ত অকাট্য নজির তুলে সপ্রমাণ করেছেন যে, বাঙ্গালা ভাষার আমি একেবারে সর্বনাশ করে দিয়েছি। এত সত্বর এত বড় দুষ্কার্য কি করে করলাম তা-ও আমি বিদিত নই, কি-ই বা এর কৈফিয়ত সেও আমার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। সুতরাং তথ্যপূর্ণ গভীর গবেষণার লেশমাত্রও আমার কাছে আপনারা আশা করবেন না।

বাদ-প্রতিবাদে লিপ্ত হওয়া আমার স্বভাব নয়, আত্মপক্ষ সমর্থন করবার মত শক্তি বা উদ্যম কোনটাই আমার নেই, আমি শুধু আমার স্বল্পপরিসর সাহিত্যিক জীবনের পরিণতির গোটাকয়েক সাদামাটা কথাই আপনাদের কাছে বলতে পারি। হয়ত বলার একটু প্রয়োজনও আছে। জবাবদিহির স্বরূপে নয়, কারণ পূর্বেই বলেছি এ আমি করিনে, করার আবশ্যকতাও মনে করিনে,—এ কেবল একজন আধুনিক সাহিত্য-সেবকের নিতান্তই নিজের কথাটাই বলতে চাই। পরলোকের ব্যাপার আমি জানিনে, কিন্তু ইহলোকের মানবের জীবন-যাত্রা পথের যতদূরে দৃষ্টি চলে, দেখা যায়, বিশ্বমানব একটা বস্তু লক্ষ্য করে নিরন্তর চলেছে—তার তিনটে অংশ—art, morality এবং ধর্ম,—religion. সংসারের সমস্ত মারামারি কাটাকাটি, একের রাজ্য অপরের কেড়ে নেওয়া, একজনের দুঃখের উপার্জন অন্যজনের ঠকিয়ে নেওয়া,—সর্ববিধ কাম ক্রোধ লোভ মোহ—এরা পথের জঞ্জাল, চলার কাঁটা,— কিন্তু মানবের যে বৃহত্তর প্রাণ তার লক্ষ্য শুধু ওইখানে।

মারবাড়ী তার কাপড়ের দোকানে বসে এ কথা শুনলে হাসবে, বার্ড কোম্পানির বড়সাহেব তার অফিসের টেবিলে এ সত্য উপলব্ধি করতে পারবে না, stock-exchange-এর ভিড়ের মধ্যে এ কথা একেবারে মিথ্যে বলে মনে হবে, তবুও আমি জানি তাদেরও শেষগতি ওইখানে এবং এর চেয়ে বড় সত্যও আর নেই। কিসের জন্যে এত লোভ, এত মোহ? কিসের জন্যে এই বাদ-বিসংবাদ? কিসের জন্যে এমন ঐশ্বর্যের কামনা? সত্যকার যা ঐশ্বর্য সে চিরদিনই মানুষের নিত্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত। মানুষ একাকী তাকে অর্জন করে, সঞ্চয় করে, কিন্তু যে মুহূর্তে সে ঐশ্বর্য হয়ে দাঁড়ায় সেই মুহূর্তেই সে তার একমাত্র আপন ভোগের বাইরে গিয়ে পড়ে। ঐশ্বর্যকে একাকী ভোগ করবার চেষ্টা করলেই সে আপনাকে আপনি ব্যর্থ করে দেয়। যা সর্বমানবের একার লোভ সেখানে পরাভূত হবেই হবে।আর এই ঐশ্বর্যের চরম পরিণতি কোথায়? সুন্দর এবং মঙ্গলের সাধনায়,—art, morality এবং ধর্মে। এ একলার নয়, এ ঐশ্বর্য বিশ্ব-মানবের জেনে এবং না জেনে, মানুষের চেষ্টা মানুষের উদ্যম এই ঐশ্বর্য আহরণের দিকেই অবিশ্রাম চলেছে,—অতএব, যা অসুন্দর, যা immoral, যা অকল্যাণ, কিছুতেই তা art নয়, ধর্ম নয়। Art for art's sake কথাটা যদি সত্য হয়, তা হলে কিছুতেই তা immoral এবং অকল্যাণকর হতে পারে

না; এবং অকল্যাণকর এবংimmoral হলে art for art's sake কথাটাও কিছুতে সত্য নয়; শতসহস্র লোকে তুমুল শব্দ করে বললেও সত্য নয়। মানব জাতির মধ্যে যে বড় প্রাণটা আছে সে একে কোন মতেই গ্রহণ করে না। সুতরাং, সত্যকার কবি বলে যথার্থ artist বলে যাকে এক হাতে গ্রহণ করব তার সৃষ্টিকে অন্যায় বলে, কুৎসিত বলে অন্য হাতে বর্জন করা হতেই পারে না। বরঞ্চ চালাবার চেষ্টা করলেই সবচেয়ে বড় ভুল এবং বড় অন্যায়ই করা হয়।

কিন্তু এ ত গেল theory-র দিক দিয়ে, আদর্শবাদের দিক দিয়ে। এর মধ্যে হয়ত তত বিবাদ নেই। কিন্তু কবির মধ্যে, artist-এর মধ্যে, অর্থাৎ তার নিজের মধ্যেই যেখানে একটা ছোটমানুষ থাকে, হাঙ্গামা বাধে তাকে নিয়ে। এখানে লোভ, মোহ, যশঃ, নিন্দে, prejudice, সংস্কার মাঝে মাঝে এমন কুহেলিকা গড়ে তোলে যে, তার অন্ধকার আশ্রয়েই অনেক fraud, অনেক উৎপাত ঢুকে গিয়ে দারুণ উপদ্রবের ভিত্তিস্থাপন করে। এইখানেই হল অসত্য এবং অকল্যাণের দ্বার। এই আঁধারে অধিকারী এবং অনধিকারী, কবি এবং অকবি, সুন্দর ও কুৎসিত, কাব্য এবং নোংরামিতে মিলে যে মন্থন শুরু করে দেয়, তার কাদাই ছিটকে উঠে নির্বিচারে সকলের মুখে পাঁক মাখিয়ে দেয়। এ কাদা ধুয়ে দিতে পারে শুধু কাল। এর হাতেই শুধু অনাগত ভবিষ্যতে শুদ্ধ ও স্নাত হয়ে সত্যবস্তু মানুষের চোখে পড়ে। এই জন্যই বোধ হয় কবির মধ্যে যে অংশটুকু তাঁর কবি, এই চরম বিচারের প্রতীক্ষা করতে তাঁর বাধে না, কিন্তু যে-টুকু তাঁর ছোট্ট মানুষ তারই কেবল সবুর সয় না। সে কলহ করে, বিবাদ করে, দল পাকায়, হাতনাগাদ নগদ মূল্য চুকিয়ে না নিলেই তার নয়। সাময়িক কাগজপত্রে এই স্থানটাই তার বার বার ঘুলিয়ে ওঠে।

পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ বলেন, তিনি স্কুল-মাস্টার নন,—তিনি কবি। বেত হাতে ছেলে মানুষ করা তাঁর পেশা নয়।এই নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যক্ত এবং অব্যক্ত কটুকথার বিরাম নেই। কটুকথার মালিক যাঁরা তাঁরা বোধ করি কবির উক্তির এইরূপ অর্থ করেন যে, যেহেতু তিনি বেত হাতে ছেলে মানুষ করতে সম্মত নন, গল্পচ্ছলে ভুলিয়ে বুড়ো ছেলেদের নীতিশিক্ষা দিতে চান না, তখন নিশ্চয়ই তাঁর ছেলে বইয়ে দেওয়াই অভিসন্ধি।

কিন্তু কাব্য—যা সত্যকার কাব্য, সে যে চির-সুন্দর, চির-কল্যাণকর, কবির অন্তরের এই কথাটা তাঁরা উপলব্ধি করেতেই চান না। এবং, ওই সব ফন্দি-ফিকিরের মধ্যেই যে কবি এবং কাব্য আপনাদের আপনি নিষ্ফল করে তোলে এই সত্যটাই তাঁরা বিস্মৃত হন।

এই কথাটাই আমি গোটা-দুই দৃষ্টান্ত দিয়ে পরিস্ফুট করতে চাই। আমার নিজের পেশা উপন্যাস-সাহিত্য, সুতরাং এই সাহিত্যের দু-একটা কথা বলা বোধ করি নিতান্তই অনধিকার চর্চা বলে গণ্য হবে না। যাঁরা আমার নমস্য আমার গুরুপদবাচ্য তাঁদের লেখা থেকে এক-আধটা উদাহরণ দিলে যদি বা একটু বিরুদ্ধ মত থাকে, আশা করি আপনাদের কেহই তাকে অসম্মান বা অশ্রদ্ধা বলে ভুল করবেন না। আমার সাহিত্যিক জীবনের পরিণতির প্রসঙ্গে এর প্রয়োজনও আছে। গোটা-দুই শব্দ আজকাল প্রায় শোনা যায়, Idealistic and Realistic. আমি নাকি এই শেষ সম্প্রদায়ের লেখক। এই দুর্নামই আমার সবচেয়ে বেশি। অথচ, কি করে যে এই দু'টোকে ভাগ করে লেখা যায়, আমার অজ্ঞাত। Art জিনিসটা মানুষের সৃষ্টি, সে nature নয়। সংসারে যা-কিছু ঘটে,—এবং অনেক নোংরা জিনিসই ঘটে,—তা কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়। প্রকৃতির বা স্বভাবের হুবহু নকল করা Photography হতে পারে, কিন্তু সে কি ছবি হবে? দৈনিক খবরের কাগজে অনেক-কিছু রোমহর্ষণ ভয়ানক ঘটনা ছাপা থাকে, সে কি সাহিত্য? চরিত্র-সৃষ্টি কি এতই সহজ? আমাকে অনেকেই দয়া করে বলেন, মশাই আমি এমন ঘটনা জানি যে, সে যদি আপনাকে বলি, ত আপনার চমৎকার একটা বই হতে পারে।

আমি বলি, তা হলে আপনি নিজেই সেটা লিখুন।

তাঁরা বলেন, তা হলে আর ভাবনা ছিল কি? ওইটে যে পারিনে!

আমি বলি, আজ না পারলেও দু'দিন পরে পারতে পারেন। অমন জিনিসটে খামকা হাতছাড়া করবেন না।

এঁরা জানেন না, সংসারে অদ্ভুত কিছু একটা জানাই সাহিত্যিকের বড় উপকরণ নয়। আমি ত জানি কি করে আমার চরিত্রগুলি গড়ে ওঠে। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আমি উপেক্ষা করচি নে, কিন্তু, বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণে কত ব্যথা, কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে ফোটে, সে আর কেউ না জানে আমি ত জানি। সুনীতি দুর্নীতির স্থান এর মধ্যে আছে, কিন্তু বিবাদ করবার জায়গা এতে নেই,—এ বস্তু এদের অনেক উচ্চে। এদের গণ্ডগোল করতে দিলে যে গোলযোগ বাধে কাল তাকে ক্ষমা করে না। নীতি-পুস্তক হবে, কিন্তু সাহিত্য হবে না। পুণ্যের জয় এবং পাপের ক্ষয়, তাও হবে, কিন্তু কাব্যসৃষ্টি হবে না।

আমার মনে আছে, ছেলেবেলায় 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' রোহিণীর চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল। সে পাপের পথে নেমে গেল। তারপরে পিস্তলের গুলিতে মারা গেল। গরুর গাড়িতে বোঝাই হয়ে লাশ চালান গেল। অর্থাৎ হিন্দুত্বের দিক দিয়ে পাপের পরিণামের বাকী কিছু আর রইল না। ভালই হল। হিন্দু সমাজও পাপীর শাস্তিতে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। কিন্তু আর একটা দিক? যেটা এদের চেয়ে পুরাতন, এদের চেয়ে সনাতন,—নর-নারীর হৃদয়ের গভীরতম, গূঢ়তম প্রেম?— আমার আজও যেন মনে হয়, দুঃখে সমবেদনায় বঙ্কিমচন্দ্রের দুই চোখ অশ্রুপরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, মনে হয়, তাঁর কবিচিত্ত যেন তাঁরই সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির পদতলে আত্মহত্যা করে মরেছে।

অনেকবারই আমার মনে হয়েছে, রোহিণীর চরিত্র আরম্ভ করবার সময়ে এ কল্পনা তাঁর ছিল না, থাকলে এমন করে তাকে গড়তে পারতেন না। কেবল প্রেমের জন্যই নিঃশব্দে সংগোপনে বারুণীর জলতলে আপনাকে আপনি বিসর্জন দিতে পাপিষ্ঠাকে কবি এমন করে নিয়োজিত করতেন না।

গোবিন্দলালকে রোহিণীর অকৃত্রিম এবং অকপটেই ভালবেসেছিল,—সমস্ত হৃদয়-প্রাণ দিয়েই ভালবেসেছিল, এবং এ প্রেমের প্রতিদান যে সে পায়নি তাও নয়। কিন্তু হিন্দুধর্মের সুনীতির আদর্শে এ প্রেমের সে অধিকারী নয়, এ ভালবাসা তার প্রাপ্য নয়।

সে পাপিষ্ঠা, তাই পাপিষ্ঠাদের জন্য নির্দিষ্ট নীতির আইনে বিশ্বাসঘাতিনী তার হওয়া চাই এবং হলও সে। তার পরের ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মিনিট-পাঁচেকের দেখায় নিশাকরের প্রতি আসক্তি এবং পিস্তলের গুলিতে মৃত্যু। মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করিনে, কিন্তু করি তার অকারণ, অহেতুক জবরদস্তির অপমৃত্যুতে। হতভাগিনীর অস্বাভাবিক মরণে পাঠক-পাঠিকার সুশিক্ষা থেকে আরম্ভ করে সমাজের বিধি ও নীতির convention সমস্তই বেঁচে গেল, সন্দেহ নেই, কিন্তু ম'ল সে, আর তার সঙ্গে সত্য, সুন্দর art। উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে, নীতির চোখরাঙানিতে তার মরা চলে না।

ঠিক এই অজুহাতেই শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় আমার 'পল্লী-সমাজের' বিধবা রমাকে তাঁর 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' পুস্তকে বিদ্রূপ করে বলেছেন, "তিনি ঠাকুরানী বুদ্ধিমতী না? বুদ্ধিবলে তোমার পিতার জমিদারি শাসন করিতে পারিলে, আর তুমিই কিনা তোমার বাল্যসখা পরপুরুষ রমেশকে ভালবাসিয়া ফেলিলে? এই তোমার বুদ্ধি? ছিঃ?।" এ ধিক্কার art-এর নয়, এ ধিক্কার সমাজের, এ ধিক্কার নীতির অনুশাসন। এদের মানদণ্ড এক নয়, বর্ণে বর্ণে ছত্রে ছত্রে এক করার প্রয়াসের মধ্যেই যত গলদ, যত বিরোধের উৎপত্তি।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবুর সামাজিক ধিক্কার art-এর রাজ্যে কতখানি মহামারী উপস্থিত করতে পারে তার আর একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু একজন প্রবীণ সাহিত্যিকের একটি ছোটগল্প আছে, তার plot-টা অত্যন্ত সংক্ষেপে এইরূপ,—নায়ক একজন বড়লোক জমিদার। Hero, অতএব, হৃদয় প্রশস্ত, প্রাণ উচ্চ, নৈতিক-বুদ্ধি অতিশয় সূক্ষ্ম। কলকাতায় তাঁর একটা মস্তবড় বাড়ি আছে; ভাড়া খাটে, দাম প্রায় লাখো টাকা। এক তারিখে বাড়িটা মাস-খানেকের জন্যে একজন ভাড়া নিলে। বাড়িওয়ালা জমিদার ত পাশের বাড়িতেই থাকেন, হঠাৎ একদিন রাত্রে তিনি ওই বাড়িটার ভেতর থেকে একজন স্ত্রীলোকের কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন। দিন-দুই পরে অনুসন্ধানে জানা গেলে, বাড়িটার মধ্যে ভ্রূণহত্যা হয়েছে। কিন্তু ভাড়াটেরা বাড়িভাড়া না দিয়েই পালিয়েছে। তাদের ঠিকানা জানা নেই; পাপের দণ্ড দেওয়া অসম্ভব, তাই তিনি হুকুম দিলেন, বাড়িটা

ভেঙ্গেচুরে মাঠ করে দাও। পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে অতবড় লাখো টাকার বাড়ি ভেঙ্গে মাঠ হয়ে গেল।

গল্প এইখানেই সমাপ্ত হল। প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন English-এর প্রবীণ অধ্যাপক এই গল্প পাঠ করে সাশ্রুনেত্রে বারবার বলতে লাগলেন, জীবনে এমন শিক্ষাপ্রদ সুন্দর গল্প আর পড়েন নাই এবং এমন গল্প বাঙ্গালা সাহিত্যে যত বাড়ে ততই মঙ্গল।

এমন গল্প আমিও যে বেশি পড়িনি সে কথা অস্বীকার করিনে, এবং বাড়ি যখন আমারও নয়, অধ্যাপকেরও নয়, গ্রন্থকারেরও নয়, তখন যত ইচ্ছে ভেঙ্গেচুরে মাঠ করে দিলেও আপত্তি নেই, কিন্তু art ও সাহিত্যের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাঁর মনে যে কি ভাবের উদয় হয়েছে সে শুধু তিনিই জানেন।

ভাল-মন্দ সংসারে চিরদিনই আছে,—ভালকে ভাল, মন্দকে মন্দ বলায় কোন art-ই কোন দিন আপত্তি করে না। কিন্তু দুনিয়ায় যা কিছু সত্যই ঘটে নির্বিচারে তাকেই সাহিত্যের উপকরণ করলে সত্য হতে পারে, কিন্তু সত্য-সাহিত্য হয় না।

অর্থাৎ, যা কিছু ঘটে তার নিখুঁত ছবিকেও আমি যেমন সাহিত্য-বস্তু বলিনে, তেমনি যা ঘটে না, অথচ, সমাজ বা প্রচলিত নীতির দিক দিয়ে ঘটলে ভাল হয়, কল্পনার মধ্য দিয়ে তার উচ্ছৃঙ্খল গতিতেও সাহিত্যের ঢের বেশি বিড়ম্বনা ঘটে।

আমার অবসর অল্প, বক্তব্য বস্তুকে আমি পরিস্ফুট করতে পারিনি, এ আমি জানি, কিন্তু আধুনিক-সাহিত্য-রচনায় সমাজের একশ্রেণীর শুভাকাঙ্ক্ষীদের মনের মধ্যে কোথায় অত্যন্ত ক্ষোভ ও ক্রোধের উদয় হয়েছে, বিরোধের আরম্ভ যে কোন্‌খানে, সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করাটুকু বোধ করি আমার সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু আলোচনা ঘোরতর করে তোলবার আমার প্রবৃত্তি নেই, সময় নেই, শক্তিও নেই, শুধু অশেষ শ্রদ্ধাভাজন আমাদের পূর্ববর্তী

সাহিত্যাচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবার পথে কোথায় বাধা পেয়ে আমরা যে অন্য পথে চলতে বাধ্য হয়ে পড়েছি, সেই আভাসটুকু মাত্র আপনাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করলাম।

পরিশেষে যে গৌরব আজ আমাকে আপনারা দিলেন, তার জন্যে আর একবার অন্তরের ধন্যবাদ জানিয়ে এই ক্ষুদ্র ও অক্ষম প্রবন্ধ আমি শেষ করলাম।

(১৩৩১ সালের ১০ই আশ্বিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।)

সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি

আমি জানি, সাহিত্য-শাখার সভাপতি হবার যোগ্য আমি নই, এবং আমারই মত যাঁরা প্রাচীন, আমারই মত যাঁদের মাথার চুল এবং বুদ্ধি দুই-ই পেকে সাদা হয়ে উঠেছে তাঁদেরও এ বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নেই। কারো মনে ব্যথা দেবার আমার ইচ্ছা ছিল না, তবুও যে এই পদ গ্রহণে সম্মত হয়েছিলাম, তার একটি মাত্র কারণ এই যে, নিজের অযোগ্যতা ও ভক্তিভাজনগণের মনঃপীড়া, এত বড় বড় দু'টো ব্যপারকে ছাপিয়েও তখন বারংবার এই কথাটাই আমার মনে হয়েছিল যে, এই অপ্রত্যাশিত মনোনয়নের দ্বারা নবীনের দল আজ জয়যুক্ত হয়েছেন। তাঁদের সবুজ-পতাকার আহ্বান আমাকে মানতেই হবে, ফল তার যাই কেন না হউক। আর এ প্রার্থনাও সর্বান্তঃকরণে করি, আজ থেকে যাত্রা-পথ যেন তাঁদের উত্তরোত্তর সুগম এবং সাফল্যমণ্ডিত হয়।

ষোল বৎসর পূর্বে বাঙ্গালার সাহিত্যিকগণের বার্ষিক সম্মিলনের আয়োজন যখন প্রথম আরব্ধ হয়, আমি তখন বিদেশে। তারও বহুদিন পর পর্যন্তও আমি কল্পনাও করিনি যে, সাহিত্য-সেবাই একদিন আমার পেশা হয়ে উঠবে। প্রায় বছর-দশেক পূর্বে কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিকের আগ্রহ ও একান্ত চেষ্টার ফলেই আমি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়ে পড়ি।

বাঙ্গালার সাহিত্য-সাধনার ইতিহাসে এই বছর-দশেকের ঘটনাই আমি জানি। সুতরাং এ বিষয়ে বলতেই যদি কিছু হয়, ত এই স্বল্প কয়টা বছরের কথাই শুধু বলতে পারি।

মাস-কয়েক পূর্বে পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ আমাকে বলেছিলেন, এবারে যদি তোমার লক্ষ্ণৌ সাহিত্য-সম্মিলনে যাওয়া হয়, ত অভিভাষণের বদলে তুমি একটা গল্প লিখে নিয়ে যেও। অভিভাষণের পরিবর্তে গল্প! আমি একটু বিস্মিত হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি শুধু উত্তর দিয়েছিলেন, সে ঢের ভাল।

এর অধিক আর কিছু তিনি বলেন নি। এতদিন বৎসরের পর বৎসর যে সাহিত্য-সম্মিলন হয়ে আসছে, হয় তার অভিভাষণগুলির প্রতি তাঁর আগ্রহ নাই, না হয়, আমার যা কাজ, সেই আমার পক্ষে ভাল, এই কথাই তাঁর মনের মধ্যে ছিল। একবার ভেবেছিলাম লক্ষ্ণৌ যখন যাওয়াই হল না, তখন যেখানে যাচ্ছি সেখানেই তাঁর আদেশ পালন করব। কিন্তু নানা কারণে সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত করতে পারলাম না। কিন্তু আজ এই অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর লেখা পড়তে উঠে আমার কেবলই মনে হচ্ছে, সেই আমার ঢের ভাল ছিল। একজন সাধারণ সাহিত্য-সেবকের পক্ষে এত বড় সভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সাহিত্যের ভাল-মন্দ বিচার করতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা আর নেই।

বঙ্গসাহিত্যের অনেকগুলি বিভাগ,—দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস। সেই সেই বিভাগীয় সভাপতিদের পাণ্ডিত্য অসাধারণ, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ এবং মার্জিত; তাঁদের কাছে আপনারা অনেক নব নব রহস্যের সন্ধান পাবেন, কিন্তু আমি সামান্য একজন গল্প লেখক। গল্প লেখার সম্বন্ধেই দু-একটা কথা বলতে পারি, কিন্তু সাহিত্যের দরবারে তার কতটুকুই বা মূল্য! কিন্তু সেটুকু মূল্যও আমি আপনাদের নির্বিচারে দিতে বলিনে, কোন দিন বলিনি, আজও বলব না। এ শুধু আমার নিতান্তই নিজের কথা। যে কথা সাহিত্য-সাধনার দশ বৎসরকাল আমি নিঃসংশয়ে, অকুণ্ঠিতচিত্তে ধরে আছি।

এই দশ বৎসরে একটা জিনিস আমি আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে লক্ষ্য করে এসেছি যে, দিনের পর দিন এর পাঠকসংখ্যা নিরন্তর বেড়ে চলেছে। আর তেমনি অবিশ্রান্ত এই অভিযোগেরও অন্ত নেই যে, দেশের সাহিত্য দিনের পর দিন অধঃপথেই নেমে চলেছে। প্রথমটা সত্য, এবং দ্বিতীয়টা সত্য হলে, ইহা দুঃখের কথা, ভয়ের কথা; কিন্তু ইহার প্রতিরোধের আর যা উপায়ই থাক, সাহিত্যিকদের কেবল কটু কথার চাবুক মেরে মেরেই তাঁদের দিয়ে পছন্দমত ভাল ভাল বই লিখিয়ে নেওয়া যাবে না। মানুষ ত গরু ঘোড়া নয়! আঘাতের ভয় তার আছে, এ কথা সত্য, কিন্তু অপমানবোধ বলেও যে তার আর একটা বস্তু আছে, এ কথাও তেমনই সত্য। তার কলম বন্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু ফরমায়েসী

বই আদায় করা যায় না। মন্দ বই ভাল নয়, কিন্তু তাকে ঠেকাবার জন্যে সাহিত্য-সৃষ্টির দ্বার রুদ্ধ করে ফেলা সহস্রগুণ অধিক অকল্যাণকর।

কিন্তু দেশের সাহিত্য কি নবীন সাহিত্যিকের হাতে সত্য সত্যই নীচের দিকে নেমে চলেছে? এ যদি সত্য হয়, আমার নিজের অপরাধও কম নয়, তাই এই কথাটাই আজ আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই। এ কেবল আলোচনার জন্যেই আলোচনা নয়, এই শেষ কয় বৎসরের প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা দেখে আমার মনে হচ্ছে, যেন সাহিত্য-সৃষ্টির উৎস-মুখ ধীরে ধীরে অবরুদ্ধ হয়ে আসছে। সংসারে রাবিশ বই-ই কেবল একমাত্র রাবিশ নয়, সমালোচনার ছলে দায়িত্ববিহীন কটূক্তির রাবিশেও বাণীর মন্দিরপথ একেবারে সমাচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর চারিদিকের সাহিত্যিকমণ্ডলী একদিন বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশ উদ্ভাসিত করে রেখেছিলেন। কিন্তু মানুষ চিরজীবী নয়, তাঁদের কাজ শেষ করে তাঁরা স্বর্গীয় হয়েছেন। তাঁদের প্রদর্শিত পথ, তাঁদের নির্দিষ্ট ধারার সঙ্গে নবীন সাহিত্যিকদের অনৈক্য ঘটেছে—ভাষা, ভাব ও আদর্শে। এমন কি, প্রায় সকল বিষয়েই। এইটেই অধঃপথ কিনা, এই কথাই আজ ভেবে দেখবার।

আর্ট-এর জন্যই আর্ট, এ কথা আমি পূর্বেও কখনও বলিনি, আজও বলিনে। এর যথার্থ তাৎপর্য আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। এটা উপলব্ধির বস্তু, কবির অন্তরের ধন।

সংজ্ঞা নির্দেশ করে অপরকে এর স্বরূপ বুঝান যায় না। কিন্তু সাহিত্যের আর একটা দিক আছে, সেটা বুদ্ধি ও বিচারের বস্তু। যুক্তি দিয়ে আর একজনকে তা বুঝান যায়। আমি এই দিকটাই আজ বিশেষ করে আপনাদের কাছে উদ্ঘাটিত করতে চাই। বিষ্ণুশর্মার দিন থেকে আজও পর্যন্ত আমরা গল্পের মধ্য থেকে কিছু একটা শিক্ষা লাভ করতে চাই। এ প্রায় আমাদের সংস্কারের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। এদিকে কোন ত্রুটি হলে আর আমরা

সইতে পারিনে। সক্রোধ অভিযোগের বান যখন ডাকে, তখন এই দিককার বাঁধ ভেঙ্গেই তা হুঙ্কার দিয়ে ছোটে। প্রশ্ন হয়, কি পেলাম, কতখানি এবং কোন্ শিক্ষালাভ আমার হল। এই লাভালাভের দিকটাতেই আমি সর্বপ্রথমে দৃষ্টি দিতে চাই।

মানুষ তার সংস্কার ও ভাব নিয়েই ত মানুষ; এবং এই সংস্কার ও ভাব নিয়েই প্রধানতঃ নবীন সাহিত্য-সেবীর সহিত প্রাচীনপন্থীর সংঘর্ষ বেধে গেছে। সংস্কার ও ভাবের বিরুদ্ধে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায় না, তাই নিন্দা ও কটুবাক্যের সূত্রপাতও হয়েছে এইখানে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি। বিধবা-বিবাহ মন্দ, হিন্দুর ইহা মজ্জাগত সংস্কার। গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে বিধবা নায়িকার পুনর্বিবাহ দিয়ে কোন সাহিত্যিকেরই সাধ্য নাই, নিষ্ঠাবান হিন্দুর চক্ষে সৌন্দর্য সৃষ্টি করবার। পড়বামাত্রই মন তাঁর তিক্ত-বিষাক্ত হয়ে উঠবে। গ্রন্থের অন্যান্য সমস্ত গুণই তাঁর কাছে ব্যর্থ হয়ে যাবে। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন গভর্নমেণ্টের সাহায্যে বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ করেছিলেন, তখন তিনি কেবল শাস্ত্রীয় বিচারই করেছিলেন, হিন্দুর মনের বিচার করেন নি। তাই আইন পাস হলে বটে, কিন্তু হিন্দুসমাজ তাকে গ্রহণ করতে পারলে না। তাঁর অতবড় চেষ্টা নিষ্ফল হয়ে গেল। নিন্দা, গ্লানি, নির্যাতন তাঁকে অনেক সইতে হয়েছিল, কিন্তু তখনকার দিনের কোন সাহিত্যসেবীই তাঁর পক্ষ অবলম্বন করলেন না। হয়ত, এই অভিনব ভাবের সঙ্গে তাঁদের সত্যই সহানুভূতি ছিল না, হয়ত, তাঁদের সামাজিক অপ্রিয়তার অত্যন্ত ভয় ছিল, যে জন্যই হউক, সেদিনের সে ভাবধারা সেইখানেই রুদ্ধ হয়ে রইল—সমাজদেহের স্তরে স্তরে, গৃহস্থের অন্তঃপুরে সঞ্চারিত হতে পেলে না। কিন্তু এমন যদি না হত, এমন উদাসীন হয়ে যদি তাঁরা না থাকতেন, নিন্দা, গ্লানি, নির্যাতন—সকলই তাঁদিগকে সইতে হত সত্য, কিন্তু আজ হয়ত আমরা হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থার আর একটা চেহারা দেখতে পেতাম। সে দিনের হিন্দুর চক্ষে যে সৌন্দর্য-সৃষ্টি কদর্য, নিষ্ঠুর ও মিথ্যা প্রতিভাত হত, আজ অর্ধ শতাব্দী পরে তারই রূপে হয়ত আমাদের নয়ন ও মন মুগ্ধ হয়ে যেত। এমনই ত হয়, সাহিত্য-সাধনায় নবীন সাহিত্যিকের এই ত সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা। সে জানে, আজকের লাঞ্ছনাটাই জীবনে তার একমাত্র এবং সবটুকু নয়, অনাগতের মধ্যে তারও দিন আছে; হউক সে শত বর্ষ পরে, কিন্তু সে দিনের ব্যাকুল, ব্যথিত নর-নারী শত লক্ষ হাত বাড়িয়ে আজকের দেওয়া তার

সমস্ত কালি মুছে দেবে। শাস্ত্রবাক্যের মর্যাদা হানি করা আমার উদ্দেশ্য নয়, প্রচলিত সামাজিক বিধি-নিষেধের সমালোচনা করবার জন্যও আমি দাঁড়াই নি। আমি শুধু এই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, শত কোটি বর্ষের প্রাচীন পৃথিবী আজও তেমনি বেগেই ধেয়ে চলেছে, মানব-মানবীর যাত্রা-পথের সীমা আজও তেমনই সুদূরে। তার শেষ পরিণতির মূর্তি তেমনই অনিশ্চিত, তেমনই অজানা।

শুধুই কি কেবল তার কর্তব্য ও চিন্তার ধারাই চিরদিনের মত শেষ হয়ে গেছে? বিচিত্র ও নব নব অবস্থার মাঝ দিয়ে তাকে অহর্নিশি যেতে হবে,—তার কত রকমের সুখ, কত রকমের আশা-আকাঙ্ক্ষা,—থামবার জো নেই, চলতেই হবে,—শুধু কি তার নিজের চলার উপরেই কোন কর্তৃত্ব থাকবে না? কোন্ সুদূর অতীতে তাকে সেই অধিকার হতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করা হয়ে গেছে! যাঁরা বিগত, যাঁরা সুখ-দুঃখের বাহিরে, এ দুনিয়ার দেনা-পাওনা শোধ দিয়ে যাঁরা লোকান্তরে গেছেন, তাঁদের ইচ্ছা, তাঁদেরই চিন্তা, তাঁদের নির্দিষ্ট পথের সঙ্কেতই কি এত বড়? আর যাঁরা জীবিত, ব্যথায় বেদনায় হৃদয় যাঁদের জর্জরিত, তাঁদের আশা, তাঁদের কামনা কি কিছুই নয়? মৃতের ইচ্ছাই কি চিরদিন জীবিতের পথ রোধ করে থাকবে? তরুণ-সাহিত্য ত শুধু এই কথাটাই বলতে চায়! তাদের চিন্তা, ভাব আজ অসঙ্গত, এমন কি, অন্যায় বলেও ঠেকতে পারে, কিন্তু তারা না বললে বলবে কে? মানবের সুগভীর বাসনা, নর-নারীর একান্ত নিগূঢ় বেদনার বিবরণ সে প্রকাশ করবে না ত করবে কে? মানুষকে মানুষ চিনবে কোথা দিয়ে? সে বাঁচবে কি করে?

আজ তাকে বিদ্রোহী মনে হতে পারে, প্রতিষ্ঠিত বিধি-ব্যবস্থার পাশে হয়ত তার রচনা আজ অদ্ভুত দেখাবে, কিন্তু সাহিত্য ত খবরের কাগজ নয়! বর্তমানের প্রাচীর তুলে দিয়ে ত তার চতুঃসীমানা সীমাবদ্ধ করা যায় না। গতি তার ভবিষ্যতের মাঝে। আজ যাকে চোখে দেখা যায় না, আজও যে এসে পৌঁছেনি, তারই কাছে তার পুরস্কার, তারই কাছে তার সম্বর্ধনার আসন পাতা আছে।

কিন্তু তাই বলে আমরা সমাজ-সংস্কারক নই। এ ভার সাহিত্যিকের উপরে নাই। কথাটা পরিস্ফুট করবার জন্য যদি নিজের উল্লেখ করি, অবিনয় মনে করে আপনারা অপরাধ নেবেন না। 'পল্লী-সমাজ' বলে আমার একখানা ছোট বই আছে। তার বিধবা রমা বাল্যবন্ধু রমেশকে ভালবেসেছিল বলে আমাকে অনেক তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে। একজন বিশিষ্ট সমালোচক এমন অভিযোগও করেছিলেন যে, এত বড় দুর্নীতি প্রশ্রয় দিলে গ্রামে বিধবা আর কেউ থাকবে না। মরণ-বাঁচনের কথা বলা যায় না, প্রত্যেক স্বামীর পক্ষেই ইহা গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু আর একটা দিক্‌ও ত আছে। ইহার প্রশ্রয় দিলে ভাল হয় কি মন্দ হয়, হিন্দু-সমাজ স্বর্গে যায় কি রসাতলে যায়, এ মীমাংসার দায়িত্ব আমার উপরে নাই। রমার মত নারী ও রমেশের মত পুরুষ কোন কালে, কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দু-সমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হল এই যে, এত বড় দু'টি মহাপ্রাণ নর-নারী এ জীবনে বিফল, ব্যর্থ, পঙ্গু হয়ে গেল। মানবের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে বেদনার এই বার্তাটুকুই যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি, ত তার বেশি আর কিছু করবার আমার নেই। এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যিকের নয়। রমার ব্যর্থ জীবনের মত এ রচনা বর্তমানে ব্যর্থ হতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের বিচারশালায় নির্দোষীর এত বড় শাস্তিভোগ একদিন কিছুতেই মঞ্জুর হবে না, এ কথা আমি নিশ্চয় জানি। এ বিশ্বাস না থাকলে সাহিত্যসেবীর কলম সেইখানেই সে দিন বন্ধ হয়ে যেত।

আগেকার দিনে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিরুদ্ধে আর যা নালিশই থাক, দুর্নীতির নালিশ ছিল না; ওটা বোধ করি তখনও খেয়াল হয়নি। এটা এসেছে হালে। তাঁরা বলেন, আধুনিক সাহিত্যের সবচেয়ে বড় অপরাধই এই যে, তার নর-নারীর প্রেমের বিবরণ অধিকাংশই দুর্নীতিমূলক, এবং প্রেমেরই ছড়াছড়ি। অর্থাৎ নানাদিক দিয়ে এই জিনিসটাই যেন মূলতঃ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তু হয়ে উঠেছে।

নেহাত মিথ্যে বলেন না। কিন্তু তার দুই-একটা ছোটখাটো কারণ থাকলেও মূল কারণটাই আপনাদের কাছে বিবৃত করতে চাই। সমাজ জিনিসটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে মানিনে। বহুদিনের পুঞ্জীভূত, নর-নারীর বহু মিথ্যা, বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিলে আছে। মানুষের খাওয়া-পরা-থাকার মধ্যে এর শাসনদণ্ড অতি সতর্ক নয়, কিন্তু এর একান্ত নির্দয় মূর্তি দেখা দেয় কেবল নর-নারীর ভালবাসার বেলায়। সামাজিক উৎপীড়ন সব চেয়ে সইতে হয় মানুষকে এইখানে। মানুষ একে ভয় করে, এর বশ্যতা একান্তভাবে স্বীকার করে, দীর্ঘদিনের এই স্তূপীকৃত ভয়ের সমষ্টিই পরিশেষে বিধিবদ্ধ আইন হয়ে ওঠে, এর থেকে রেহাই দিতে কাউকে সমাজ চায় না। পুরুষের তত মুশকিল নেই, তাঁর ফাঁকি দেবার রাস্তা খোলা আছে, কিন্তু কোথাও কোন সূত্রেই যার নিষ্কৃতির পথ নেই সে শুধু নারী। তাই সতীত্বের মহিমা-প্রচারই হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ সাহিত্য। কিন্তু এই propaganda চালানোর কাজটাকেই নবীন সাহিত্যিক যদি তার সাহিত্য-সাধনার সর্বপ্রধান কর্তব্য বলে গ্রহণ করতে না পেরে থাকে, ত তার কুৎসা করা চলে না; কিন্তু কৈফিয়তের মধ্যেও যে তার যথার্থ চিন্তার বহু বস্তু নিহিত আছে, এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না।

একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা নবীন সাহিত্যিক বোঝে, এর প্রতি তার সম্মান ও শ্রদ্ধার অবধি নেই, কিন্তু সে সইতে যা পারে না, সে এর নাম করে ফাঁকি। তার মনে হয়, এই ফাঁকির ফাঁক দিয়েই ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যে-অসত্য তাদের আত্মায় সংক্রামিত করে নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সেই তাদের সমস্ত জীবন ধরে ভীরু, কপট, নিষ্ঠুর ও মিথ্যাচারী করে তোলে। সুবিধা ও প্রয়োজনের অনুরোধে সংসারে অনেক মিথ্যাকেই হয়ত সত্য বলে চালাতে হয়, কিন্তু সেই অজুহাতে জাতির সাহিত্যকেও কলুষিত করে তোলার মত পাপ অল্পই আছে। আপাত-প্রয়োজন যাই থাক, সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হতে একে মুক্তি দিতেই হবে। সাহিত্য জাতীয় ঐশ্বর্য; ঐশ্বর্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত। বর্তমানের দৈনন্দিন প্রয়োজনে তাকে যে ভাঙ্গিয়ে খাওয়া চলে না, এ কথা কোন মতেই ভোলা উচিত নয়।

পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়, এই কথাটা একদিন আমি বলেছিলাম। কথাটাকে যৎপরোনাস্তি নোংরা করে তুলে আমার বিরুদ্ধে গালিগালাজের আর সীমা রইল না। মানুষ হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল। অত্যন্ত সতী নারীকে আমি চুরি, জুয়াচুরি, জাল ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দেখেছি এবং ঠিক এর উল্‌টোটা দেখাও আমার ভাগ্যে ঘটেছে। এ সত্য নীতি-পুস্তকে স্বীকার করার আবশ্যকতা নেই। কিন্তু বুড়ো ছেলেমেয়েকে যদি গল্পচ্ছলে এই নীতিকথা শেখানোর ভার সাহিত্যকে নিতে হয়, ত আমি বলি, সাহিত্য না থাকাই ভাল। সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্বেও ছিল না, পরেও হয়ত একদিন থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, এ কথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায়, ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?

সাহিত্যের সুশিক্ষা, নীতি ও লাভালাভের অংশটাই এতক্ষণ ব্যক্ত করে এলাম। যেটা তার চেয়েও বড়,—এর আনন্দ, এর সৌন্দর্য, নানা কারণে তার আলোচনা করবার সময় পেলাম না। শুধু একটা কথা বলে রাখতে চাই যে, আনন্দ ও সৌন্দর্য কেবল বাহিরের বস্তুই নয়। শুধু সৃষ্টি করবার ত্রুটিই আছে, তাকে গ্রহণ করবার অক্ষমতা নাই, এ কথা কোন মতেই সত্য নয়। আজ একে হয়ত অসুন্দর আনন্দহীন মনে হতে পারে; কিন্তু ইহাই যে এর শেষ কথা নয়, আধুনিক-সাহিত্য সম্বন্ধে এ সত্য মনে রাখা প্রয়োজন।

আর একটি মাত্র কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব। ইংরাজীতে Idealistic ও Realistic বলে দু'টো বাক্য আছে। সম্প্রতি কেউ কেউ এই অভিযোগ উত্থাপিত করেছেন যে, আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য অতিমাত্রায় realistic হয়ে চলেছে। একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা হয় না। অন্ততঃ উপন্যাস যাকে বলে, সে হয় না। তবে কে কতটা কোন ধার ঘেঁষে চলবে, সে নির্ভর করে সাহিত্যিকের শক্তি ও রুচির উপরে। তবে একটা নালিশ এই করা যেতে পারে যে, পূর্বের মত রাজারাজড়া, জমিদারের দুঃখ-দৈন্যদ্বন্দ্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্যসেবীর মন আর ভরে না! তারা নীচের স্তরে নেমে গেছে। এটা আপসোসের কথা নয়। বরঞ্চ এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশ-সাহিত্যের মত যে দিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে

তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সে দিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।

কিন্তু আর না। আপনাদের অনেক সময় নিয়েছি, আর নিতে পারব না। কিন্তু বসবার আগে আর একটা কথা জানাবার আছে। বাঙ্গালার ইতিহাসে এই বিক্রমপুর বিরাট গৌরবের অধিকারী। বিক্রমপুর পণ্ডিতের স্থান, বীরের লীলাক্ষেত্র, সজ্জনের জন্মভূমি। আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ চিত্তরঞ্জন এই দেশেরই মানুষ। মুন্সীগঞ্জে যে মর্যাদা আপনারা আমাকে দিয়েছেন, সে আমি কোনদিন বিস্মৃত হব না। আপনারা আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার গ্রহণ করুন।

(১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে মুন্সীগঞ্জে সাহিত্য-সভার সভাপতির অভিভাষণ।)

ভারতীয় উচ্চ-সঙ্গীত

বিগত আষাঢ় মাসের 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় লিখিত 'সঙ্গীতের সংস্কার' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহার একটি প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভারতবর্ষে ছাপিবার জন্য পাঠান। কিন্তু লেখক কি কারণে জানেন না, তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত প্রতিবাদ-প্রবন্ধ ফেরত আসায় "বাধ্য হয়ে গরম গরম প্রবন্ধটি একেবারে জুড়িয়ে যাবার আগে তাকে 'বঙ্গবাণীর' উদার অঙ্কে ন্যাস্ত" করেছেন। প্রবন্ধটি 'বঙ্গবাণীর' মাঘের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীযুক্ত প্রমথবাবু তাঁহার প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন—"আমি সেই প্রত্নতত্ত্ববিৎকে বেশি তারিফ করি যে একখানি তাম্রশাসন খুঁড়ে বের করেছে ও পড়েচে—কিন্তু সে কবিকেও তারিফ করি না যে নতুনের গান না গেয়ে কেবল 'নতুন কিছু করো'র গান গেয়েছে।" প্রবন্ধটি কেন যে ফেরত আসিয়াছে বুঝা কঠিন নয়। খুব সম্ভব ভারতবর্ষের বুড়া সম্পাদক দিলীপকুমারের প্রবন্ধের প্রতিবাদে তাঁহার স্বর্গগত বন্ধু, দিলীপের পিতার প্রতি এই অহেতুক কটাক্ষ হজম করিতে পারেন নাই। এবং সেই কবি নূতন গান না গেয়ে "শুধু কেবল 'নতুন কিছু করোর' গানই গেয়েছেন"—প্রমথবাবুর এই উক্তিটিকে অসত্য জ্ঞান করে তাঁহার প্রেরিত এই উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধটিকে ত্যাগ করে থাকেন ত তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

সে যা হউক, না ছাপিবার কি কারণ তা তিনিই জানেন কিন্তু দিলীপকুমারের বিরুদ্ধে অধিকাংশ বিষয়েই প্রমথবাবুর সহিত আমি যে একমত তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। এমন কি ষোল আনা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। প্রমথবাবু হিন্দুস্থানী সঙ্গীত লইয়া চুল পাকাইয়াছেন, তথাপি দিলীপের বক্তব্যের অর্থগ্রহণ করা শক্তিতে তাঁহার কুলায় নাই। প্রমথবাবু বলিতেছেন তিনি কথার কারবারী নহেন, সুতরাং 'বিনাইয়া নানা ছাঁদে' কথা

বলিতে পারিবেন না–তবে মোদ্দা কথায় গালিগালাজ যা করিবেন তাহাতে ঝাপসা কিছুই থাকিবে না।

প্রমথবাবুর চুল পাকিয়াছে, আমার আবার তাহা পাকিয়া ঝরিয়া গেছে। দিলীপ বলিতেছেন, "আমাদের সঙ্গীতে 'একটা নূতন কিছু' করার সময় এসেছে, তা আমাদের সঙ্গীত যতই বড় হোক–কেন না প্রাণধর্মের চিহ্নই গতিশীলতা।" কিন্তু বলিলে কি হইবে? দিলীপের যখন একগাছিও চুল পাকে নাই, তখন এ–সকল কথা আমরা গ্রাহ্যই করিব না।

দিলীপ বলিতেছেন, "যে আসলটুকু আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি,–তাকে হয় সুদে বাড়াও, না হয় আসলটুকু খোয়া যাবে, এই হচ্চে জ্ঞানরাজ্যের ও ভাবরাজ্যের চিরন্তন রহস্য।"

প্রমথবাবু বলিতেছেন, "এ সাধারণ সত্য আমরা সকলেই জানি।" জানিই ত।

পুনশ্চ বলিতেছেন, "কিন্তু সৃজন কাজটা এত সোজা নয় যে, যে-কেউ ইচ্ছা করলেই পারবে। এ পৃথিবী এত উর্বর হলে ...। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারায় যদি পঞ্চাশ-ষাট বৎসর কোন নূতন সৃষ্টি না হয়ে থাকে তাহলে সেটা এতবড় দীর্ঘকাল নয় যে, আমাদের অধীর হয়ে উঠতে হবে।"

আমারও ইহাই অভিমত। আমাদের চুল পাকিয়াছে, দিলীপের পাকে নাই। আমরা উভয়ে সমস্বরে বলিতেছি, অধীর হইয়া ছটফট করা অন্যায়। পৃথিবী অত উর্বর নয়। পঞ্চাশ-ষাট বছরের বেশি হয় নাই যে, ইহারই মধ্যে ছটফট করিবে! আর যতই কেন কর না, কিছুই হইবে না সে স্পষ্টই বলিয়া দিতেছি,–ইহাতে ঝাপসা কিছুই নাই।

কিন্তু ইহার পরেই যে প্রমথবাবু বলিতেছেন, "যখন কোন স্রষ্টা সৃষ্টির প্রতিভা নিয়ে আসবে, তখন সে সৃষ্টি করবেই, শৃঙ্খল ভাঙবেই, অচলায়তন ভূমিসাৎ করবেই–তাকে

কেউ ঠেকিয়ে, কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না ...”। প্রমথবাবুর এ উক্তি আমি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, কারণ সংসারে কয়টা লোকে আমার নাম জানিয়াছে? কয়টা লোক আমাকে স্বীকার করিতেছে? ও-পাড়ার মনু দত্ত যে মনু দত্ত, সে পর্যন্ত আমাকে দাবাইয়া রাখিয়াছে! পৃথিবীতে অবিচার বলিয়া কথাটা তবে আছে কেন? যাক, এ আমার ব্যক্তিগত কথা। নিজের সুখ্যাতি নিজের মুখে করিতে আমি বড়ই লজ্জা বোধ করি।

কিন্তু ইহার পরেই প্রমথবাবু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় উচ্চ-সঙ্গীত সম্বন্ধে যে সত্য ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার সাধ্য কাহারও নাই। প্রমথবাবু বলিতেছেন, “ভারতের উচ্চ-সঙ্গীত ভাবসঙ্গত। কেবল সা রে গা মা পর্দা টিপে শ্রুতি-সুখকর শব্দ-পরম্পরা উৎপন্ন করলেই সে সঙ্গীত হয় না। এক কথায় রাগ-রাগিণীর ঠাট বা কাঠাম ভাবগত, পর্দাগত নয়।”

আমিও ইহাই বলি, এবং আমাদের নাগ মহাশয়েরও ঠিক তাহাই অভিমত। তিনি পঞ্চাশোর্ধ্বে লড়াইয়ের বাজারে অর্থশালী হইয়া একটা হারমোনিয়ম কিনিয়া আনিয়া নিরন্তর এই সত্যই প্রতিপন্ন করিতেছেন।

তিনি স্পষ্টই বলেন, সা রে গা মা আর কিছুই নয়, সা’র পরে জোরে চেঁচাইলেই রে হয়, এবং আরও একটু চেঁচাইলে গা হয়, এবং আর ও জোর করিয়া একটুখানি চেঁচাইলে গলায় মা সুর বাহির হয়। খুব সম্ভব, তাঁহারও মতে উচ্চ সঙ্গীত ‘ভাবগত’, ‘পর্দাগত’ নয়। এবং ইহাই সপ্রমাণ করিতে হারমোনিয়মের চাবি টিপিয়া ধরিয়া নাগ মহাশয় ভাবগত হইয়া যখন উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের শব্দ-পরম্পরা সৃজন করিতে থাকেন, সে এক দেখিবার শুনিবার বস্তু। শ্রীযুক্ত প্রমথবাবুর সঙ্গীত-তত্ত্বের সহিত তাঁহার যে এতাদৃশ মিল ছিল, আমিও এতদিন তাহা জানিতাম না। আর তখন দ্বারদেশে যে প্রকারের ভিড় জমিয়া যায় তাহাতে প্রমথবাবুর উল্লিখিত ওস্তাদজীর রেয়াজের গল্পটির সহিত এমন বর্ণে বর্ণে যে সাদৃশ্য আছে তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

প্রমথবাবু বলিতেছেন, "যে চালের ধ্রুপদ লুপ্তপ্রায় হয়েছে, এবং যা লুপ্ত হয়ে গেলেও দিলীপকুমারের মতে আক্ষেপ করবার কিছুই নেই, আমার মতে সেই হচ্চে খাঁটি উঁচুদরের ধ্রুপদ। এ ধ্রুপদের নাম খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ!"

ঠিক তাহাই। আমারও মতে ইহাই খাঁটি উঁচুদরের ধ্রুপদ। এবং, মনে হইতেছে নাগ মহাশয় সম্প্রতি এই খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদের চর্চাতেই নিযুক্ত আছেন। তাঁহার জয় হউক।

বৈশাখের 'ভারতী'তে দিলীপকুমার কোন্ ওস্তাদজীকে মল্লযোদ্ধা এবং কোন্ ওস্তাদজীর গলায় বেসুরা আওয়াজ বাহির হইবার কথা লিখিয়াছেন, আমি পড়ি নাই কিন্তু অনেকের সম্বন্ধেই যে এই দু'টি অভিযোগই সত্য, তাহা আমিও আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সত্য বলিয়া জানি। প্রমথবাবু বাঙ্গালাদেশের প্রতি প্রসন্ন নহেন। চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে মশায়ের মুখের গান তাঁহার ভাল লাগে না, কিন্তু বেশিদিনের কথা নয়, এই দেশেরই একজন চক্রবর্তীমশাই ছিলেন, প্রমথবাবুর বোধ করি তাঁহাকে মনে নাই।

প্রমথবাবু লিখিতেছেন, "যে জন্য আলাপের পর ধ্রুপদ, ধ্রুপদের পর খেয়াল এবং খেয়ালের পর টপ্পা ঠুংরির সৃষ্টি হয়েছিল, সেই জন্যই ওই-সবের পর বাঙ্গালা দেশে কীর্তন, বাউল ও সারি গানের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই শেষোক্ত তিন রীতির সঙ্গীত আমার খাঁটি বাঙ্গালার জিনিস হলেও উচ্চ-সঙ্গীতের তরফ থেকে আমি তাদের বিকাশকে অভিনন্দন করতে পারি না। কেন?"

কেন? কেননা আমরা বলচি যে "তারা অতীতের সঙ্গে যোগভ্রষ্ট!"

কেন? কেননা আমরা বলচি "তারা অনেকটা ভুঁই-ফোঁড়ের মত নিজের বিচ্ছিন্ন অহঙ্কারে ঠেলে উঠেছে।" এমন কি একজনের পাকা চুল এবং আর একজনের ন্যাড়া মাথার অহঙ্কারের উপরেও।

কেন? কেননা, "আজকাল এইটেই বড় মজা দেখতে পাই যে, অতীতকে তুচ্ছ করে কেবল প্রতিভার জোরে ভবিষ্যৎ গড়তে আমরা সকলেই ব্যগ্র!"

শুধু প্রতিভার জোরে ভবিষ্যৎ গড়বে? সাধ্য কি! আমরা পাকা চুল এবং ন্যাড়া মাথা বলচি সে হবে না! বাধা আমরা দেবই দেব!

"আজকাল প্রতীচ্যের অনেক বিজাতীয় সঙ্গীতের স্রোত এমনি ভাবে আমাদের মনের মধ্যে ঢুকে পড়েচে যে, আমরা যখনই আমাদের প্রাচ্য সঙ্গীতের চাল বা প্রকাশ-ভঙ্গীকে এতটুকু বিচিত্র করতে যাই তখনই তা একটা জগাখিচুড়ি হয়ে ওঠে।"

কেন? কেননা আমরা বলচি, তা জগাখিচুড়ি হয়ে ওঠে!

কেন? কেননা আমরা বলচি,—একশ'বার বলচি, ও দু'টো তেল-জলের মত পরস্পরবিরোধী।

আমরা পাকা চুল এবং ন্যাড়া মাথা এক সঙ্গে গলা ফাটিয়ে বলচি ও-দু'টো অগুরু, চন্দনের সঙ্গে ল্যাভেন্ডার, ওডিকলোনের মত পরস্পরবিরোধী! উঃ! অগুরু চন্দন ও ল্যাভেন্ডার ওডিকলোন! এতবড় যুক্তির পরে দিলীপকুমারের আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে আমরা তা ভাবিয়া পাই না।

অতঃপর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নালিশ করিতেছেন, "খাড়া পর্দা হতে খাড়া পর্দার উপরে সেইভাবে লাফিয়ে পড়া, যেভাবে কোন বীরপুঙ্গব স্বর্ণলঙ্কার এক ছাদ হতে আর এক ছাদে লাফিয়ে পড়েছিলেন ... ইত্যাদি ইত্যাদি।"

ইহা অতিশয় ভয়ের কথা! এবং প্রমথবাবুর সহিত আমি একযোগে ঘোরতর আপত্তি করি। যেহেতু ছাদের উপর নৃত্য শুরু করিলে আমরা, যাহারা নীচে সুনিদ্রায় মগ্ন, তাহাদের অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটে। তদ্ভিন্ন অন্য আশঙ্কাও কম নয়। কারণ আমরা যদিচ ন্যাড়ামাথা,

কিন্তু স্বর্ণলঙ্কার প্রতি যিনি বিরূপ তিনি যদি বাঁড়ুয্যে মশায়ের পাকা চুলকে গায়ের সাদা লোম ভাবিয়া ছাদে লম্ফ দিতে বাধ্য করেন, ত বিপদের অবধি থাকিবে না।

প্রমথবাবু কহিতেছেন, "ধ্রুপদ ও খেয়াল দুই-ই ভারত-সঙ্গীতের দু'টি বিচিত্র ও মৌলিক বিকাশ, কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে ধ্রুপদই যে অধিক সৌন্দর্যশালী, তা নিরপেক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করবেন।"

স্বীকার করিতে বাধ্য! স্বীকার না করিলে তিনি হয় নিরপেক্ষ নহেন, না হয় সঙ্গীতজ্ঞ নহেন। হেতু? হেতু এই যে, একজন পাকাচুল এবং একজন ন্যাড়ামাথা উভয়ে সমস্বরে বলিতেছি! জোর করিয়া বলিতেছি! ইহার পরেও যে সংসারে কি যুক্তি থাকিতে পারে আমরা ত ভাবিয়া পাই না! আমরা পুনশ্চ বলিতেছি যে, "ধ্রুপদ হচ্চে সব রীতির গানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, গরিষ্ঠ ও পূজ্যতম!" দুনিয়ায় এমন অর্বাচীন কে আছে যে, এতবড় অখণ্ড যুক্তির সম্মুখেও লজ্জায় অধোবদন না হয়! তবু ত শক্তিশেল হানিলাম না। বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের 'মুখপাতের' যুক্তিটা চাপিয়া গেলাম।

আমাদের ওস্তাদদের সম্বন্ধে দিলীপকুমার বলিয়াছেন যে, আমরা ছাত্রদের পক্ষে মাছিমারা নকলের পক্ষপাতী, অর্থাৎ ছাত্রদের আমরা গ্রামোফোন করিয়াই রাখিতে চাই, দিলীপকুমারের এ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

প্রমথবাবু ত স্পষ্টই বলিতেছেন, "আমি ত কোন দিনই আমার ছাত্রদের নিজস্ব ব্যক্তিত্বকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করিনি,—কেন না, স্বাধীন স্ফূর্তির অবসর না দিলে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়।...ইত্যাদি।"

আমার নিজের ছাত্রদের সম্বন্ধেও আমার ঠিক ইহাই অভিমত। এবং শিক্ষাদানের যথার্থ উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায় তাহা আমরা কেহই চাহি না। (অবশ্য কিঞ্চিৎ অবান্তর হইলেও এ কথা বোধ করি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমার নিজের ছাত্র নাই।

কারণ, যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোন ছাত্রই আমার কাছে শিখিতে চাহে না। লোকের মুখে-মুখে শুনিতে পাই, এমন দুর্বিনীত ছাত্রও আছে, যে বলে যে ওঁর কাছে শেখার চেয়ে বরঞ্চ প্রমথবাবুর কাছে গিয়া শিখিব।)

সে যাই হউক, কিন্তু ছাত্রদের সম্বন্ধে আমরা উভয়েই দিলীপকুমারের অভিযোগের পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ করি। এইরূপ হীন পন্থা আমরা কেহই অবলম্বন করি না। উনিও না, আমিও না।

আরও একটা কথা। আমাদের ওস্তাদদের মুদ্রাদোষ সম্বন্ধে দিলীপকুমার যে-সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই অসার এবং অসঙ্গত। প্রমথবাবু যথার্থই বলিয়াছেন, "মানুষ যখন কোন একটা ভাবের আবেশে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে, তখন আর জ্ঞান থাকে না।" সত্যই তাই। জ্ঞান থাকে না। আমাদের নাগমশায় যখন খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ চর্চা করেন দিলীপকুমার আসিয়া তাহা স্বচক্ষে একবার দেখিয়া যান! বাস্তবিক, থাকে না!

কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, আর না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রত্যেক ছত্রটি তুলিয়া দিবার লোভ হয়, কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে বলিয়াই বিরত রহিলাম। তাঁহার পক্ষিসমাজের 'এক ঘরে' হওয়ার বিবরণটিও যেমন জ্ঞানগর্ভ, তেমনি বিস্ময়কর। শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। পরিশেষে প্রবন্ধ সমাপ্তও করিয়াছেন তেমনি সারবান কথা বলিয়া—"আসল কথা, সকল বিষয়েই অধিকারীভেদ আছে।" অর্থাৎ, গান গাহিতে জানিলেই যে প্রবন্ধ লিখিতে হবে, এবং এক কাগজে না ছাপিলে আর এক কাগজে ছাপিতেই হইবে, তাহা নয়,—অধিকারীভেদ আছে।

———-

('ভারতবর্ষ', ১৩৩১ ফাল্গুন সংখ্যা হইতে গৃহীত।)

আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ত

শিবপুরের এই ক্ষুদ্র সমিতির সাহিত্য-শাখার পক্ষ হইতে আপনাদিগের সম্বর্ধনার ভার একজন সাহিত্য-ব্যবসায়ীর হাতে পড়িয়াছে। আমি আপনাদিগকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিতেছি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কয়েকটি সাহিত্যিক জমায়েত হইয়া গিয়াছে; তাহাদের আয়োজন ও আয়তনের বিপুলতার কাছে এই ক্ষুদ্র অধিবেশনটি আরও ক্ষুদ্র কিন্তু আপনাদের পদার্পণে এই ক্ষুদ্র বস্তুটি আজ যে গৌরব লাভ করিবে, তাহাকে কিছুতেই যে আর ছোট বলা চলিবে না, এই লোভই আমরা কোনমতে সম্বরণ করিতে পারি নাই।

সমস্ত বিশ্বের বরণীয় কবি আজ আমাদের সভাপতি। অনেক কষ্টে তাঁহাকে সংগ্রহ করিয়াছি; শুধু কেবল তাঁহাকে মাঝখানে পাইবার লোভেই নয়,—এই সভাপতি লইয়া অনেক ক্ষেত্রে অনেকেরই মর্মপীড়ার কারণ ঘটে। আমরা তাই স্থির করিয়াছিলাম যে, এমন এক ব্যক্তিকে আনিয়া হাজির করিব, যাঁহার সর্বোচ্চ স্থানটি লইয়া তর্ক না থাকে,—এই আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে মর্মদাহের যেন আর লেশমাত্র অবকাশ না ঘটে।

সর্বপ্রকার সভা-সমিতিতেই গতিবিধি আমার অল্প। কখনো বা খবর পাই না বলিয়া, এবং কখনো বা পারিয়া উঠি না বলিয়াই যাওয়া হয় না। অতএব সাহিত্যের নাম দিয়া দেশের মধ্যে সচরাচর যে-সকল দরবার বসে, সেখানে ঠিক যে কি-সব হয় আমি জানি না। তবে, ঘরে বসিয়া সংবাদপত্রাদির মারফতে যে-সকল তথ্য পাই তাহা হইতে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মিয়াছে। আজিকার এই সমবেত সাহিত্যিকগণের সম্মুখে আমি সবিনয়ে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিব।

বহু ধনীর সমাগমে আড়ম্বর-বহুল দেশের এই-সকল সাহিত্যিক-জনতায় দরিদ্র সাহিত্যিকগণ উপস্থিত হন কি না আমি নিশ্চয় জানি না। এবং হইলেও, কিছু তাঁহারা তথায় বলিবার প্রয়াস করেন কি না, তাহাও অবগত নই। হয়ত কিছু বলেন, কিন্তু সভার

একান্ত হইতে নিরন্ন, নিছক-সাহিত্যসেবীর ক্ষীণকণ্ঠ প্রবল পক্ষের উদ্দাম কোলাহলে খুব সম্ভব ঢাকা পড়িয়া যায়—তাঁহাদের কথা আমাদের কানে পৌঁছে না।

কিন্তু কণ্ঠ যাঁহাদের চাপা পড়ে না,—কথা যাঁহাদের সাধারণের কানে ঢাকের মত পিটিতে থাকে,—গলায় তাঁহাদের জোর আছে বলিয়া আমি দ্বেষ করি না, কিংবা সাহিত্য-সাধনায় বৎসরের তিন শ' চৌষট্টি দিনই সাহিত্যিকগণকে অকাতরে ছাড়িয়া দিয়া কেবল মাত্র একটি দিন যাঁহারা নিজেদের হাতে রাখিয়াছেন, এইরূপ বিনীত ও উদার ব্যক্তিদের প্রতি ঈর্ষা হওয়াও সম্ভবপর নয়। কিন্তু এই একটা মাত্র দিনের উদ্যম যখন তাঁহাদের সকল সীমা অতিক্রম করিয়া যায়, তখন দুই-একটা কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

এইখানে আমি একটা কথা ভাল করিয়া বলিয়া রাখিতে চাই যে, কোন ব্যক্তি বা সমিতিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া আমি একটা কথাও বলিতেছি না। কারণ, ইহা বিশেষ কোন লোক বা বিশেষ কোন সমিতির খেয়ালের ব্যাপার হইলে বলার কোন প্রয়োজনই হইত না। আমি সাধারণভাবেই আমার মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি।

আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, সাহিত্য রচনার কাজটাকে বাহুল্য মনে করিয়া যাঁহারা ইহার সমালোচনার কাজে মনোনিবেশ করিয়াছেন, বক্তব্য তাঁহাদের প্রধানতঃ দুইটি। অন্য শাখা-প্রশাখা অনেক আছে,—সে কথা পরে হইবে।

প্রথমে তাঁহারা বলেন যে, বাঙ্গালা ভাষার মত ভাষা আর কাহার আছে? আমাদের সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে; আমাদের সাহিত্য 'নোবেল প্রাইজ' পাইয়াছে; এমন কি আমাদের সাহিত্য যে খুব ভালো, এ কথা বিলাতের সাহেবরা পর্যন্ত বলিতেছে। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এতবড় উন্নতি কোন্ দেশে আর কবে করিয়াছে?

তাঁহাদের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালা সাহিত্য রসাতলে গেল,—আর বাঁচে না। আবর্জনায় বাঙ্গালা সাহিত্য বোঝাই হইয়া উঠিল, আমাদের কথা কেহ শুনে না; হায়!

হায়! বঙ্কিমচন্দ্র বাঁচিয়া নাই, মুগুর মারিবে কে? ঝুড়ি ঝুড়ি নাটক নভেল ও কবিতা বাহির হইতেছে, তাহাতে সুশিক্ষা নাই—তাহা নিছক দুর্নীতিপূর্ণ। ইহার কুফলও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। কারণ প্রত্নতত্ত্বের যে-সকল বই এখনও লেখা হয় নাই, তাহার প্রতি পাঠকদিগের আগ্রহ দেখা যাইতেছে না, এবং ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি ভাল ভাল বই পাঠকদিগের উৎসাহের অভাবে লেখাই হইতেছে না।

অবশ্য আমি স্বীকার করি, যে-সকল বই লেখা হয় নাই, তাহা না পড়িবার প্রায়শ্চিত্ত কি আমি জানি না, এবং পাঠকের আগ্রহের অভাবে যে-সকল পণ্ডিত ব্যক্তিদের বই লেখা বন্ধ হইয়া আছে, ইহারই যে কি উপায় আছে, তাহাও আমার গোচর নয়, কিন্তু ঝুড়ি ঝুড়ি বই লেখা সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবারও আছে এবং বোধ হয় বলিবার সামান্য দাবীও আছে।

যাঁহারা এই অভিযোগ আনেন তাঁহারা কখনো কি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন বাস্তবিক কয়টা বই মাসে মাসে বাহির হয়? ভাল ও মন্দে মিলাইয়া আজ পর্যন্ত কয়খানা নাটক, নভেল ও কবিতার বই বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহাদের সংখ্যা কত? বঙ্গসাহিত্য আমাদের বিশ্ব-সাহিত্যে জায়গা লইয়াছে জানি, কিন্তু শুধু কেবল আমরাই ত নয়, আরও ত কেহ কেহ আছেন বিশ্ব-সাহিত্যে যাঁহারা আমাদেরই মত স্থান পাইয়াছেন, তাঁহাদের নাটক নভেলের তুলনায় কয়খানা নাটক নভেল বাঙ্গালায় আছে? কবিতার বই বা কয়টা বাহির হইয়াছে? নাটক নভেলে বাঙ্গালা দেশ প্লাবিত হইয়া গেল, এ বুলি কে আবিষ্কার করিয়াছিলেন আমি জানি না, কিন্তু এখন যে-কেহ দেখি আপনাকে বঙ্গ-সাহিত্যের বিচারক বলিয়া স্থির করেন, তিনিই এই বুলি নির্বিচারে আবৃত্তি করিয়া যান, মনে করেন, সমঝদার বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিবার ইহার চেয়ে বড় পথ আর নাই।

কথায় কথায় তাঁহারা বিশ্ব-সাহিত্যের উল্লেখ করেন, কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত সত্যকার পরিচয় যদি তাঁহাদের থাকিত, ত জানিতেন যাহাকে তাঁহারা আবর্জনা বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করেন, সেই আবর্জনাই সকল সাহিত্যের বনিয়াদ, তাহারাই সাহিত্যের অস্থি-

মজ্জা। মেঘদূত, চণ্ডীদাস, গীতাঞ্জলি কোন সাহিত্যেই ঝুড়ি ঝুড়ি সৃষ্টি হয় না। এবং আবর্জনা থাকে বলিয়াই ইহাদের জন্মলাভ সম্ভবপর হইয়াছে; না হইলে হইত না। আবর্জনার বালাই যেদিন দূর হইবে, সেদিন যাহাকে তাঁহারা সারবস্তু বলিতেছেন, সেও সেই পথেই অন্তর্হিত হইবে। আবর্জনা চিরজীবী হইয়া থাকে না, নিজের কাজ করিয়া সে মরে, সেই তাহার প্রয়োজন, সেই তাহার সার্থকতা। কিন্তু সেই আবর্জনার ভার বহিতে যেদিন দেশ অস্বীকার করিবে, সেদিন আনন্দ করিবার দিন নহে, সেদিন দেশের দুর্দিন।

আর এই যে একটা কথা,—ভাল ভাল বই অর্থাৎ ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই বাহির হইতেছে না, কেবল কবিতা, কেবল উপন্যাস,—এ কথার উত্তর কি কথাসাহিত্য-লেখকদের দিবার? তাহারা বড় জোর এই কথাটাই স্মরণ করাইয়া দিতে পারে যে, বাঙ্গালা দেশের 'গীতাঞ্জলি' বাঙ্গালা দেশের 'ঘরে-বাইরে' —অর্থাৎ কথা-সাহিত্যই বিশ্ব-সাহিত্যে আসন লাভ করিয়াছে।

সম্প্রতি একটা কলরব উঠিয়াছে যে, আধুনিক উপন্যাস লেখকেরা বঙ্কিম-সাহিত্যকে ডুবাইয়া দিল। বঙ্কিম-সাহিত্য ডুবিবার নয়। সুতরাং আশঙ্কা তাহাদের বৃথা। কিন্তু আধুনিক ঔপন্যাসিকদের বিরুদ্ধে এই যে নালিশ যে, ইহারা বঙ্কিমের ভাষা, ভাব, ধরন-ধারণ, চরিত্র-সৃষ্টি কিছুই আর অনুসরণ করিতেছে না, অতএব অপরাধ ইহাদের অমার্জনীয়, ইহার জবাব দেওয়া একটা প্রয়োজন। আমি বয়েসে যদিচ প্রাচীন হইয়াছি, কিন্তু সাহিত্য-ব্যবসায় আজও আমার বছর– দশেক উত্তীর্ণ হয় নাই। অতএব আধুনিকদের পক্ষ হইতে উত্তর দিই ত বোধ করি অন্যায় হইবে না। অভিযোগ ইহাদের সত্য, আমি তাহা অকপটে স্বীকার করিতেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা আমাদের কাহারও অপেক্ষা কম নয়, এবং সেই শ্রদ্ধার জোরেই আমরা তাঁহার ভাষা, ভাব পরিত্যাগ করিয়া আগে চলিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। মিথ্যা ভক্তির মোহে আমরা যদি তাঁহার সেই ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার বস্তুই শুধু ধরিয়া পড়িয়া থাকিতাম, ত কেবলমাত্র গতির অভাবেই বাঙ্গালা সাহিত্য আজ মরিত। দেশের কল্যাণে এক দিন তিনি নিজে প্রচলিত ভাষা ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া পা বাড়াইতে ইতস্ততঃ করেন নাই, তাঁহার সেই নির্ভীক কর্তব্য-বোধের দৃষ্টান্তকেই আজ যদি

আমরা তাঁহার প্রবর্তিত সাহিত্য-সৃষ্টির চেয়েও বড় করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি, ত সে তাঁহার মর্যাদাহানি করা নয়। এবং সত্যই যদি তাঁহার ভাষা, ধরন-ধারণ, চরিত্র-সৃষ্টি প্রভৃতি সমস্তই আমরা আজ ত্যাগ করিয়া গিয়া থাকি ত দুঃখ করিবারও কিছু নাই। কথাটা পরিস্ফুট করিবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। তাঁহার মর্যাদা লঙ্ঘন করিতেছি, আশা করি এ কথা কাহারও মনে কল্পনায়ও উদয় হইবে না। ধরা যাক তাঁহার 'চন্দ্রশেখর' বই। শৈবলিনীর সম্বন্ধে লেখা আছে—"এমনি করিয়া প্রেম জন্মিল।" এই 'এমনি'টা হইতেছে—নক্ষত্র দেখা, নৌকার পাল গণনা করা, মালা গাঁথিয়া গাভীর শৃঙ্গে পরাইয়া দেওয়া, আরও দুই-একটা কি আছে, আমার ঠিক মনে নাই। কিন্তু তাহার পরবর্তী ঘটনা অতিশয় জটিল। গঙ্গায় ডুবিতে যাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া সাহেবের নৌকায় চড়িয়া পরপুরুষ কামনা করিয়া স্বামিগৃহ ত্যাগ করিয়া যাওয়া অবধি, সে-সমস্তই নির্ভর করিয়াছে শৈবলিনীর বাল্যকালে 'এমনি করিয়া' যে প্রেম জন্মিয়াছিল তাহারই উপর।

তখনকার দিনে পাঠকেরা লোক ভাল ছিল। এবং বোধ করি তখনকার দিনের সাহিত্যের শৈশবে ইহার অধিক গ্রন্থকারের কাছে তাহারা চাহে নাই, এবং এই দুষ্কৃতির জন্য শেষকালে শৈবলিনীর যে-সকল শাস্তিভোগ হইয়াছিল তাহাতেই তাহারা খুশী হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এখনকার দিনের পাঠকেরা অত্যন্ত তার্কিক, তাহারা গ্রন্থকারের মুখের কথায় বিশ্বাস করিতে চাহে না, নিজে তাহারা বিচার করিয়া দেখিতে চায় শৈবলিনী লোক কিরূপ ছিল, তাহার কতখানি প্রেম জন্মিয়াছিল, জন্মানো সম্ভবপর কি না এবং এতবড় একটা অন্যায় করিবার পক্ষে সেই প্রেমের শক্তি যথেষ্ট কি না। প্রতাপ অতবড় একটা কাজ করিল, কিন্তু এখনকার দিনের পাঠক হয়ত অবলীলাক্রমে বলিয়া বসিবে—কি এমন আর সে করিয়াছে! শৈবলিনী পরস্ত্রী, গুরুপত্নী,—নিজের ঘরে পাইয়া তাহার প্রতি অত্যাচার করে নাই, এমন অনেকেই করে না, এবং করিলে গভীর অন্যায় করা হয়। আর তার যুদ্ধের অজুহাতে আত্মহত্যা? তাহাতে পৌরুষ থাকিতে পারে, কিন্তু কাজ ভাল নয়। সংসারের উপরে, নিজের স্ত্রীর উপরে এই যে একটা অবিচার করা হইয়াছে, আমরা তাহা পছন্দ করি না। আর তাহার মানসিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত? তা আত্মহত্যায় আবার প্রায়শ্চিত্ত

কিসের? অথচ, সেকালে আমি লোককে এই বলিয়া আশীর্বাদ করিতে শুনিয়াছি, "তুমি প্রতাপের ন্যায় আদর্শ পুরুষ হও।" মানুষের মতিগতি কি বদলাইয়া গেছে!

আর একটা চরিত্রের উল্লেখ করিয়া আমি এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। সে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণীর চরিত্র। এ কথা কেন তুলিলাম হয়ত তাহা অনেকেই বুঝিবেন। সেদিনের সঙ্গে এ দিনের এইখানেই একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। তাহার জীবনের অবসান হইয়াছে পিস্তলের গুলিতে। এইরূপে তাহার পাপের শাস্তি না হইলে কানা ও খোঁড়া হইয়া তাহাকে নিশ্চয়ই কাশীর পথে পথে 'একটি পয়সা দাও' বলিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইত। তার চেয়ে এ ভালই হইয়াছে, সে মরিয়াছে। তাহার মরার সম্বন্ধে আধুনিক লেখক ও পাঠকগণের যে আপত্তি আছে তাহা নয়। কিন্তু আগ্রহও নাই। বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে আমরা অনেকটা উদাসীন। পাপের শাস্তি না হইলে গ্রন্থ শিক্ষাপ্রদ হইবে না, অতএব শাস্তি চাই-ই। এই 'চাই-ই'-এর জন্য গ্রন্থকারকে যে অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে, সেইখানেই আমাদের বড় বাধা। তাহার গোবিন্দলালকে ভালোবাসিবার যে শক্তি, সাধারণ নারীতে তাহা অসম্ভব,—উইল বদলাইতে সে কৃষ্ণকান্তের মত বাঘের ঘরে ঢুকিয়াছিল—গোবিন্দলালের ভাল করিতে, 'বারুণী'র জলতলে প্রাণ দিতে গিয়াছিল সে এমনিই প্রিয়তমের জন্য, আবার সেই রোহিণীই যখন কেবলমাত্র নীতিমূলক উপন্যাসের উপরোধেই অকারণে এবং এক মুহূর্তের দৃষ্টিপাতে সমস্ত ভুলিয়া, আর একজন অপরিচিত পুরুষকে গোবিন্দলালের অপেক্ষাও বহুগুণে সুন্দর দেখিয়া প্রাণ দিল, তখন পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় সপ্রমাণ করিয়া সাংসারিক লোকের সুশিক্ষার পথে হয়ত প্রভূত সাহায্য করা হইল, কিন্তু আধুনিক লেখক তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিল না। রোহিণী পাপিষ্ঠা, এবং যে পাপিষ্ঠার প্রতি আমাদের কোন সহানুভূতি নাই, তাহারও প্রতি কিন্তু এতবড় অবিচার করিতে আমাদের হাত উঠে না। সেকাল ও একালে এখানেই মস্তবড় ব্যবধান। বিধবা রোহিণীর দুর্ভাগ্য যে, সে গোবিন্দলালকে ভালোবাসিয়াছিল। তাহার দুর্বুদ্ধি, তাহার দুর্বলতা,—কিন্তু পাপের সঙ্গে এক করিয়া, ইহাদের একত্রে ছাপ মারিয়া দিবার যখন অনুরোধ আসে তখন সে অনুরোধ রক্ষা করাকেই আমরা অকল্যাণ বলিয়া মনে করি।

প্রবৃত্তিকে বুদ্ধির বাটখারায় ওজন করিয়া সাহিত্যের মূল্য নির্দেশ করিতে গেলে কি হয় তাহার একটা উদাহরণ দিতেছি। একটুখানি ব্যক্তিগত হইলেও আমাকে আপনারা ক্ষমা করিবেন। 'পল্লী-সমাজ' বলিয়া একটা গ্রন্থ আছে। তাহাতে বিধবা রমা রমেশকে ভালোবাসিয়াছে দেখিয়া সেদিন একজন প্রবীণ সাহিত্যিক ও সমালোচক, 'সাহিত্যের স্বাস্থ্য-রক্ষা' গ্রন্থে এইরূপে রমাকে তিরস্কার করিয়াছেন– "তুমি না অত্যন্ত বুদ্ধিমতী? তুমি বুদ্ধিবলে পিতার জমিদারি শাসন করিয়া থাক, কিন্তু নিজের চিত্ত দমন করিতে পারিলে না? তুমি এতদূর সতর্ক যে রমেশের চাকরের নামে পুলিশে ডায়েরী করাইয়া রাখিলে, অথচ তুমি শিবপূজা কর, তাহার সার্থকতা কোথায়? তোমার এই পতন নিতান্তই ইচ্ছাকৃত।" এই অভিযোগের কি কোন উত্তর আছে, বিশেষ করিয়া সাহিত্যিক হইয়া সাহিত্যিককে মানুষে যখন এমনি করিয়া জবাবদিহি করিতে চায়?

সেই ভাল-মন্দ, সেই উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন; শুধু এই উচিত-অনুচিতই রোহিণীকে গোবিন্দলালের লক্ষ্য করিয়া দাঁড় করাইয়াছিল। যেখানে ভালবাসা উচিত নয়, সেখানে ভালবাসার অপরাধ যতই হউক,– বিশ্বাসহন্ত্রীর ঢের বড় অপরাধ মৃত্যুকালে হতভাগিনীর কপালে বঙ্কিমচন্দ্রকে দাগিয়া দিতেই হইল। এই অসঙ্গত জবরদস্তিই আধুনিক সাহিত্যিক স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেছে না। ভাল-মন্দ সংসারে চিরদিনই আছে। হয়ত চিরদিনই থাকিবে। ভালকে ভাল, মন্দকে মন্দ সে-ও বলে; মন্দের ওকালতি করিতে কোন সাহিত্যিকই কোন দিন সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয় না, কিন্তু ভুলাইয়া নীতিশিক্ষা দেওয়াও সে আপনার কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করে না। দুর্নীতিও সে প্রচার করে না। একটুখানি তলাইয়া দেখিলে তাহার সমস্ত সাহিত্যিক-দুর্নীতির মূলে হয়ত এই একটা চেষ্টাই ধরা পড়িবে যে, সে মানুষকে মানুষ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে চায়।

———

(১৩৩০ সালের ১৬ আষাঢ় হাওড়া টাউন হলে অনুষ্ঠিত শিবপুর ইন্‌স্টিটিউটের সাহিত্যসভায় পঠিত অভিভাষণ।)

সাহিত্যের রীতি ও নীতি

শ্রাবণ মাসের 'বিচিত্রা' পত্রিকায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ধর্ম নিরূপণ করিয়াছেন এবং পরবর্তী সংখ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত উক্ত ধর্মের সীমানা নির্দেশ করিয়া একান্ত শ্রদ্ধাভরে কবির উদাহরণগুলিকে রূপক এবং যুক্তিগুলিকে সবিনয়ে রস-রচনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

উভয়ের মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে প্রধানতঃ আধুনিক সাহিত্যের আব্রুতা ও বে-আব্রুতা লইয়া।

ইতিমধ্যে বিনাদোষে আমার অবস্থা করুণ হইয়া উঠিয়াছে। নরেশচন্দ্রের বিরুদ্ধ দলের শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'তে আমার মতামত এমনি প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন যে, ঢোক গিলিয়া, মাথা চুলকাইয়া হাঁ ও না একই সঙ্গে উচ্চারণ করিয়া পিছলাইয়া পলাইবার আর পথ রাখেন নাই।

একবারে বাঘের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছেন।

এদিকে বিপদ হইয়াছে এই যে, কালক্রমে আমারও দুই-চারিজন ভক্ত জুটিয়াছেন; তাঁহারা এই বলিয়া আমাকে উত্তেজিত করিতেছেন যে, তুমিই কোন্ কম? দাও না তোমার অভিমত প্রচার করিয়া।

আমি বলি, সে যেন দিলাম, কিন্তু তার পরে? নিজে যে ঠিক কোন্ দলে আছি তাহা নিজেই জানি না, তা ছাড়া ওদিকে নরেশবাবু আছেন যে! তিনি শুধু মস্ত পণ্ডিত নহেন, মস্ত উকিল। তাঁর যে জেরার পরাক্রমে কবির যুক্তি-তর্ক রস-রচনা হইয়া গেল, সে-জেরার প্যাঁচে পড়িলে আমি ত এক দণ্ডও বাঁচিব না। কবি তবুও অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তির

কোঠায় পৌঁছিয়াছেন, আমি হয়ত ব্যাপ্তি অব্যাপ্তি কোনটারই নাগাল পাইব না, ত্রিশঙ্কুর ন্যায় শূন্যে ঝুলিয়া থাকিব! তখন?

ভক্তরা বলে, আপনি ভীরু।

আমি বলি, না।

তাহারা বলে, তবে প্রমাণ করুন।

আমি বলি, প্রমাণ করা কি সহজ ব্যাপার! 'রস-সৃষ্টি' রসোদ্বোধন প্রভৃতির রসবস্তুটির মত ধোঁয়াটে বস্তু সংসারে আর আছে নাকি? এ কেবল রস-রচনার দ্বারাই প্রমাণিত করা যায়,—কিন্তু সে সময় আপাততঃ আমার হাতে নাই।

এ তো গেল আমার দিকের কথা। ও-দিকের কথাটা ঠিক জানি না কিন্তু অনুমান করতে পারি।

প্রিয়পাত্ররা গিয়া কবিকে ধরিয়াছে, মশাই আমরা ত আর পারিয়া উঠি না, এবার আপনি অস্ত্র ধরুন। না না, ধনুর্বাণ নয়,—গদা। ঘুরাইয়া দিন ফেলিয়া ওই অতি-আধুনিক-সাহিত্যিক-পল্লীর দিকে। লক্ষ্য? কোন প্রয়োজন নাই। ওখানে একসঙ্গে অনেকগুলি থাকে।

কবির সেই গদাটাই অন্ধকারে আকাশ হইতে পড়িয়াছে। ইহাতে ঈপ্সিত লাভ না হউক শব্দ এবং ধূলা উঠিয়াছে প্রচুর। নরেশচন্দ্র চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন, এবং বিনীত ক্রুদ্ধকণ্ঠে বারংবার প্রশ্ন করিতেছেন, কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন বলুন? কেন করিয়াছেন বলুন? হাঁ কি না বলুন?

কিন্তু এ প্রশ্নই অবৈধ। কারণ, কবি ত থাকেন বারো মাসের মধ্যে তেরো মাস বিলাতে। কি জানেন তিনি কে আছে তোমাদের খড়্গহস্তা শুচি-ধর্মী অনুরূপা, আর কে

আছে তোমাদের বংশী-ধারী অশুচি-ধর্মী শৈলজা-প্রেমেন্দ্র-নজরুল-কল্লোল-কালিকলমের দল? কি করিয়া জানিবেন তিনি কবে কোন্ মহীয়সী জননী অতি-আধুনিক-সাহিত্যিক দলন করিতে ভবিষ্যৎ মায়েদের সূতিকা-গৃহেই সন্তান-বধের সদুপদেশ দিয়া নৈতিক উচ্ছ্বাসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, আর কবে শৈলজানন্দ কুলি-মজুরের নৈতিক হীনতার গল্প লিখিয়া আভিজাত্য খোয়াইয়া বসিয়াছে? এ-সকল অধ্যয়ন করিবার মত সময়, ধৈর্য এবং প্রবৃত্তি কোনটাই কবির নাই, তাঁহার অনেক কাজ। দৈবাৎ এক-আধটা টুক্‌রা-টাক্‌রা লেখা যাহা তাঁহার চোখে পড়িয়াছে তাহা হইতেও তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের আব্রুতা এবং আভিজাত্য দুই-ই গিয়াছে। শুরু হইয়াছে চিৎপুর রোডের খচো-খচো-খচ্‌কার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃ পুনঃ আবর্তিত গর্জন। আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি কবির এত বড় অবিচারে শুধু নরেশচন্দ্রের নয়, আমারও বিস্ময় ও ব্যথার অবধি নাই।

ভক্ত-বাক্যের মত প্রামাণ্য সাক্ষ্য আর কি আছে? অতএব, তাঁহার নিশ্চয় বিশ্বাস জন্মিয়াছে আধুনিক সাহিত্যে কেবল সত্যের নাম দিয়া নর-নারীর যৌনমিলনের শারীর ব্যাপারটাকেই অলঙ্কৃত করা চলিয়াছে। তাহাতে লজ্জা নাই, শরম নাই, শ্রী নাই, সৌন্দর্য নাই, রস-বোধের বাষ্প নাই,—আছে শুধু ফ্রয়েডের সাইকো-এনালিসিস। অথচ, যে-কোন সাহিত্যিককেই যদি তিনি ডাকিয়া পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন ত শুনিতে পাইতেন তাহারা প্রত্যেকেই জানে যে, সত্যমাত্রই সাহিত্য হয় না, জগতে এমন অনেক নোংরা সত্য ঘটনা আছে যে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া কোন মতেই সাহিত্য রচনা করে চলে না।

কবির হঠাৎ চোখে পড়িয়াছে যে, সজিনা, বক, কুমড়া প্রভৃতি কয়েকটা ফুল কাব্যে স্থান পায় নাই। গোলাপজাম ফুলও না, যদিচ সে, শিরীষ ফুলের সর্ববিষয়েই সমতুল্য। কারণ? না, সেগুলো মানুষে খায়! রান্নাঘর তাহাদের জাত মারিয়াছে। তাই উদাহরণের জন্য ছুটিয়া গিয়াছেন গঙ্গাদেবীর মকরের কাছে। অথচ, হাতের কাছে বাগ্‌দেবীর বাহন হাঁস খাইয়া যে মানুষে উজাড় করিয়া দিল, সে তাঁহার চোখে পড়িল না! কুমুদ ফুলের বীজ হইতে ভেটের খৈ হয়, এমন যে পদ্ম তাহারও বীজ লোকে ভাজিয়া খাইতে ছাড়ে

না। তিল ফুলের সহিত নাসিকার, কদলী বৃক্ষের সহিত সুন্দরীর জানুর উপমা কাব্যে বিরল নহে। অথচ, সুপক্ক মর্তমান রম্ভার প্রতি বিতৃষ্ণার অপবাদ কোন কবির বিরুদ্ধেই শুনি নাই। আজ নরেশচন্দ্র বৃথাই তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে গিয়াছেন যে, বিম্বফল অনেকে তরকারি রাঁধিয়া খায়। উত্তরে কবি কি বলিবেন জানি না, কিন্তু তাঁহার ভক্তরা হয়ত ক্রুদ্ধ হইয়া জবাব দিবেন, খাওয়া অন্যায়। যে খায় সে সৎ-সাহিত্যের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধিবশতঃই এরূপ করে।

কিন্তু এই লইয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা নিরর্থক! এগুলি যুক্তিও নয়, তর্কও নয়, কোন কাজেও লাগে না। অথচ, এই ধরনের গোটা-কয়েক এলোমেলো দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া কবি চিরদিনই জোর করিয়া বলেন, এর পরে আর সন্দেহ-ই থাকতে পারে না যে, আমি যা বোলচি তাই ঠিক এবং তুমি যা বোলচ সেটা ভুল।

কিন্তু এ কথাও আমি বলি না যে, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে দুঃখ করিবার আদৌ কারণ ঘটে নাই, কিংবা রবীন্দ্রনাথের এবংবিধ মনোভাব একেবারেই আকস্মিক। তাঁহার হয়ত মনে নাই, কিন্তু বছর-কয়েক পূর্বে আমাকে একবার বলিয়াছিলেন যে, সে দিন তাঁহার বিদ্যালয়ের একটি বারো-তেরো বছরের ছাত্র ‘পতিতা’র সম্বন্ধে একটা গল্প লিখিয়াছে।

আমার ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ে। আমাদের ছোড়দা হঠাৎ কবি-যশোলুব্ধ হইয়া কাব্য-কলায় মনোনিবেশ করিলেন। এবং বাঙ্গালা ভাষায় গভীর ভাব প্রকাশের যথেষ্ট সুবিধা হয় না বলিয়া ইংরাজী ভাষাতেই কবিতা রচনা করিলেন। রচনা করিলেন কি চুরি করিলেন জানি না, কিন্তু কবিতাটি আমার মনে আছে :

A lion killed a mouse
And carried it into his house;
Then cried his mother,
And therefore cried his sister!

ছন্দ ও ভাবের দিক দিয়া কবিতাটি অনবদ্য। কিন্তু তুমুল তর্ক উঠিল, 'মাদার' কার? সিঙ্গীর না ইঁদুরের? বড় বৌঠাকরুন ক্ষণকাল কান পাতিয়া শুনিয়া বলিলেন, না না ওদের নয়। ও কবির 'মাদার'। 'পতিতা' গল্প রচনার বিবরণ শুনিলে বৌঠাকরুন হয়ত বলিবেন, এ ক্ষেত্রে কাঁদা উচিত ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের। আর কাহারও নয়। এ ত গেল অসাধু-সাহিত্যের দিক। আবার সাধু-সাহিত্যের দিকেও তরুণ কবির অভাব নাই। এদিকে যিনিই কবিতা বা গান লেখেন, তিনিই লেখেন, তোমার বীণা আমার তারে বাজিতেছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে তোমার ঝিলিক-মারা অরূপমূর্তিটি দেখিতে পাইতেছি, বুকের মাঝে তোমার নিঃশব্দ পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছি, খেয়ার ঘাটে বসিয়া সন্ধ্যা হইয়া আসিল, কাণ্ডারি! এখন পার কর। ইত্যাদি।

একটা উদাহরণ দিই। ভাদ্র মাসের 'কেতকী' পত্রিকার গান ছাপা হইয়াছে :

তোমার ভাঙার গানে তোমায় নেব চিনি
পরাণ পাতি শুনবো পায়ের রিনিঝিনি!
(তোমার) কালবোশেখীর ঝড়ে তোমায় নেব দেখে
(তোমার) শ্রাবণ-ধারা অঙ্গে আমার নেব মেখে।
(আমার) বুকের মাঝে তোমার আঘাত চিহ্নখানি–
আমার রোদনের মাঝে তোমার দৈববাণী!
ভুল করে' যে ভুলবো তোমায় হ'বে না তা'
(তোমার) আঘাত এলে কোথায় বা তার
লুকাবো ব্যথা?
আমার ছড়িয়ে প'ল সকল খানে–
সারা বুকে
আমার জড়িয়ে গেল সকল হিয়া
দুঃখে সুখে!

সেথায় আমি তোমায় খুঁজে নেব চিনি–
(আমার) পরাণ পাতি শুন্‌বো নূপুর রিনিঝিনি।

উপরের উদ্ধৃত ইংরাজী কবিতাটির ন্যায় এ গানখানিও অনবদ্য, কি ঝঙ্কারে, কি ভাবের গভীরতায়, কি বৈরাগ্যের বেদনায়! 'কেতকী'র তরুণ সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করিলাম, রচয়িতার বয়স কত? সে বন্ধু-গৌরবে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিল, আজ্ঞে, পোনর-ষোলর বেশি নয়!

মনে মনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলাম, দেশ-সুদ্ধ সাহিত্যিক বালক-বালিকার দল যখন প্রহ্লাদ হইয়াই উঠিল, এবং 'ক' লিখিতে কৃষ্ণ স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিল, তখন ওরে অতিবৃদ্ধ! এক মাথা পাকাচুল লইয়া আর বাঁচিয়া আছিস কিসের জন্য?

সাহিত্য-সৃষ্টি অনুকরণের মধ্যে নাই। ভালোরও না, মন্দেরও না। হৃদয়ের সত্যকার অনুভূতি আনন্দ ও বেদনার আলোড়নে অলঙ্কৃত বাক্যে বিকশিত হইয়া না উঠিলে সে সাহিত্য পদবাচ্য হয় না। বৃদ্ধ কবির গীতাঞ্জলিও যত বড় কাব্যগ্রন্থ তাঁহার যৌবনের চিত্রাঙ্গদাও ঠিক তত বড়ই কাব্য-সৃষ্টি। লাঞ্ছনার আঘাত ও গৌরবের মালা যেমন করিয়াই তাঁহার শিরে বর্ষিত হউক না। অথচ, অনুভূতিহীন বাক্য যত অলঙ্কৃতই হউক ব্যর্থ। পতিতার অনুকরণও ব্যর্থ, গীতাঞ্জলির অনুকরণও ঠিক ততখানিই ব্যর্থ। দেশের সাহিত্যসম্পদ ইহাতে কণামাত্রও বর্ধিত হয় না।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি রস-বস্তু লইয়া আমি আলোচনা করিতে পারিব না। কারণ, ও আমি জানি না। রসিক অরসিকের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতেও আমি অপারক। কবির বোধের ক্ষুধা ও আত্মার ক্ষুধা ঠিক যে কি এবং কিসে মেটে সে আমার অনধিগম্য। কিন্তু একটা কথা জানি যে, কাব্য-সাহিত্য ও কথা-সাহিত্য এক বস্তু নয়। আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্য ত নয়ই! 'সোনার তরী'র যা লইয়া চলে 'চোখের বালি'র তাহাতে কুলায় না। সজিনা

ফুলে, বক ফুলে সোনার তরীর প্রয়োজন নাই, কিন্তু বিনোদিনীর রান্নাঘরে সেগুলা না হইলেই নয়। তেপান্তর মাঠ এবং পক্ষীরাজ ঘোড়া লইয়া কাব্যের চলে, কিন্তু উপন্যাস-সাহিত্যের চলে না। এখানে ঘোড়ার চার পায়ে ছুটিতে হয়, পক্ষবিস্তার করিয়া উড়ার সুবিধা হয় না।

কবি সাহিত্য-ধর্ম প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :

"মধ্যযুগে এক সময়ে য়ুরোপে শাস্ত্র-শাসনের খুব জোর ছিল। তখন বিজ্ঞানকে সেই শাসন অভিভূত করেছে। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে এ কথা বলতে গেলে মুখ চেপে ধরেছিল—ভুলেছিল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের একাধিপত্য—তার সিংহাসন ধর্মের রাজত্বসীমার বাইরে। আজকের দিনে তার বিপরীত হল। বিজ্ঞান প্রবল হ'য়ে উঠে কোথাও আপনার সীমা মানতে চায় না। তার প্রভাব মানব-মনের সকল বিভাগেই আপন পিয়াদা পাঠিয়েছে।

নূতন ক্ষমতার তকমা পরে কোথাও সে অনধিকার প্রবেশ করতে কুণ্ঠিত হয় না। বিজ্ঞান পদার্থটা ব্যক্তি-স্বভাব-বর্জিত—তার ধর্মই হচ্চে সত্য সম্বন্ধে অপক্ষপাত কৌতূহল। এই কৌতূহলের বেড়াজাল এখানকার সাহিত্যকেও ক্রমে ক্রমে ঘিরে ধরেচে।"

কবির এই উক্তির মধ্যে বহু অভিযোগ নিহিত আছে, সুতরাং কথাগুলিকে একটুখানি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই। বিজ্ঞানের প্রতি কবির হয়ত একটা স্বাভাবিক বিমুখতা আছে, কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বলিতে যে কি বুঝায় আমি বুঝিলাম না। বিজ্ঞান বলিতে যদি শুধু Sex-Psychology/Anatomy অথবা Gynaecology বুঝাইত তাহা হইলে সাহিত্যের মধ্যে অবারিত প্রবেশে আমিও বাধা দিতাম। কেবল অবাঞ্ছিত বলিয়া নয়, অহেতুক ও অসঙ্গত বলিয়া আপত্তি করিতাম। পৃথিবী সূর্যের চারিপাশে ঘোরে, ইহা যত বড় কথাই হউক, সাহিত্যের মন্দিরে ইহার প্রয়োজন গৌণ, কিন্তু যে সুবিন্যস্ত, সংযত চিন্তাধারার ফল এই জিনিসটি, সে চিন্তা নহিলে কাব্যের চলে চলুক, উপন্যাসের চলে না। বিজ্ঞান ত কেবল

অপক্ষপাত কৌতূহল মাত্রই নয়, কার্য-কারণের সত্যকার সম্বন্ধ-বিচার। চার এবং চারে আট হয়, এবং আট হইতে চার বাদ দিলে চার থাকে ইহাই বিজ্ঞান। এ মনোভাবকে ভয় কিসের? কিন্তু তাই বলিয়া নোংরামি যে সাহিত্যের অন্তর্গত নয় এ কথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। বিজ্ঞান হইলেও নয়, অবিজ্ঞান হইলেও নয়, সত্য হইলেও নয়, মিথ্যা হইলেও নয়। গল্পের ছলে ধাত্রীবিদ্যা শিখানোকেও আমি সাহিত্য বলি না, উপন্যাসের আকারে কামশাস্ত্র প্রচারকেও আমি সাহিত্য বলি না। বোধ হয় বাঙ্গালা দেশের একজনও অতি-আধুনিক সাহিত্যসেবী এ কথা বলে না।

বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া ধর্মপুস্তক রচনা করা যায়, আধ্যাত্মিক কবিতা রচনা করা যায়, রূপকথা-সাহিত্যও রচনা করা না যায় তাহা নহে, কিন্তু উপন্যাস-সাহিত্যের ইহা শ্রেষ্ঠ পন্থা নহে। রাজার পুত্র গেলেন চব্বিশ বছর বয়সে এবং তেপান্তর মাঠের দুর্গম পথ পার হইয়া রাজকন্যার সন্ধানে। কোটালপুত্রের ডিটেকটিভ বুদ্ধি তাঁহার নাই, সওদাগর পুত্রের বেনেবুদ্ধি তাঁহার নাই, আছে শুধু রস। গিয়া বলিলেন, তুমি যে তুমি এই আমার যথেষ্ট। এই রস উপভোগ করিবার মত রসজ্ঞ ব্যক্তির সংসারে অভাব নাই তাহা মানি, কিন্তু ভিন্ন রুচির লোকও ত সংসারে আছে? তাহারা গিয়া যদি বলে, রাজপুত্র, তোমার মনের মধ্যে রাজকন্যার রূপ-যৌবন স্থান পায় নাই, যৌতুকস্বরূপ অর্ধেক রাজত্বের প্রতিও তোমার কিছুমাত্র খেয়াল নাই, তুমি মহৎ,—কন্যাটি সে ঘুঁটে-কুড়োনির কন্যা নয়, রাজার কন্যা, ইহাই তোমার যথেষ্ট,—মনস্তত্ত্বের অবতারণায় প্রয়োজন নাই, কিন্তু রাজপুত্র! তোমার মনের কথাটা আরও একটু খোলসা করিয়া না বলিলে ত এই উচ্চাঙ্গের রস-সাহিত্যের সমস্ত রসটুকু উপলব্ধি করিতে পারতেছি না, তখন ইহাদের মুখেই বা হাত চাপা দিবে কে?

এই ধরনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় স্বর্গীয় সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের সাহিত্য রচনায়। পরলোকগত সাহিত্যিকের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য ইহার উল্লেখ করিতেছি না, করিতেছি হাতের কাছে একটা অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির অসম্ভব কল্পনার উদাহরণ পাইতেছি বলিয়া, বাঙ্গালা দেশে তাঁহার পাঠকসংখ্যা বিরল নয়। আমি নিজে দেখিয়াছি

মুদির দোকানে একজন গ্রন্থ পাঠ করিতেছে এবং বহুলোকে গলদশ্রুলোচনে সেই সাহিত্যসুধা পান করিতেছে।

নিষ্ঠাবান্ সচ্চরিত্র দরিদ্র নায়ক মা কালীর কাছে স্বপ্নে আদেশ পাইয়া সাত ঘড়া সোনার মোহর গাছতলা হইতে খুঁড়িয়া বাহির করিয়া বড়লোক হইল। ছেলে মরিল কিন্তু ভয় নাই। শ্মশানে জটাজূটধারী তেজঃপুঞ্জ-কলেবর এক সন্ন্যাসীর আকস্মিক আবির্ভাবে ছেলে চিতার উপরে 'বাবা' বলিয়া উঠিয়া বসিল। রসজ্ঞ শ্রোতার দল কাঁদিয়া আকুল। তাহাদের আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। সেখানে কেহই ঠেলা দিয়া প্রশ্ন করে না, কেন? কিসের জন্য? তাহারা বলে, দরিদ্র নায়ক বড়লোক হইয়াছে ঢের। মরা-ছেলে প্রাণ পাইয়াছে ইহাই আমাদের যথেষ্ট,—ইহাতেই আমাদের বোধের ক্ষুধা, আত্মার ক্ষুধা মেটে। ইহা অনির্বচনীয়,—এইপ্রকার সাহিত্য-রসেই আমাদের হৃদয়ের বসন্তলোকে কল্পলতায় ফুল ফুটে।

কলহ করিবার কি আছে? কিন্তু, আমি যদি এ কাজ না পারি, নিজের গ্রন্থের দরিদ্র নায়ককে মা কালীর অনুগ্রহ জোগাড় করিয়া দিতে সক্ষম না হই, জটাজূটধারী সন্ন্যাসীকে খুঁজিয়া না পাইয়া মরা-ছেলেকে দাহ করিতে বাধ্য হই, ত নিশ্চয় জানি আমার বই তাহারা পুড়াইয়া ছাই করিয়া ছাড়িবে। কিন্তু উপায় কি? বরঞ্চ, হাতজোড় করিয়া চতুরাননের কাছে গিয়া বলিব, তাহারা আরও খান-কয়েক বই আমার পুড়াক, সে আমার সহিবে, কিন্তু এই রসজ্ঞ ব্যক্তিদের আত্মার ক্ষুধা, বোধের ক্ষুধা মিটাইবার সৌভাগ্য "শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ"।

কিন্তু কেন? কেন, এই জন্য যে কাব্য-সাহিত্য ও কথা-সাহিত্য এক বস্তু নয়। ইহাদের ধর্মও এক নয়, ধর্মের সীমানাও এক নয়। এবং মানুষের বোধের ক্ষুধা ও আত্মার ক্ষুধার জাতিভেদ এতই গভীর ও বিস্তৃত যে, বৈজ্ঞানিক মনোভাব-নিয়ন্ত্রিত কল্পনাকে বিসর্জন দিলে ইহাদের অর্থ-ই প্রায় থাকে না।

কবির কাঁকর-পদ্মের উদাহরণে নরেশচন্দ্র বলিতেছেন, ইহা যুক্তিও নয়, নৈয়ায়িকের দৃষ্টান্তও নয়। অতএব, ইহা রস-রচনা। আমার বোধ হয় উপাখ্যান হইলেও হইতে পারে। কিন্তু অতিশয় দুরূহ। আমি ইহার তাৎপর্য বুঝিতে পারি নাই। বস্তুতঃ, কাঁকর বরণীয় কি পদ্ম বরণীয়, চড়াই পাখি ভালো কি মোটর গাড়ি ভালো বলা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু কবি তাঁহার 'সাহিত্য-ধর্মে' নর-নারীর যৌন-মিলন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমার মনে হয় উপন্যাস-সাহিত্যেও তাহা খাঁটি কথা। তাঁহার বক্তব্য বোধ হয় ইহাই যে, ও ব্যাপারটা ত আছেই। কিন্তু মানুষের মাঝে যে ইহার দু'টি ভাগ আছে, একটি দৈহিক এবং অপরটি মানসিক, একটি পাশব ও অন্যটি আধ্যাত্মিক, ইহার কোন্ মহলটি যে সাহিত্যে অলঙ্কৃত করা হইবে এইটিই আসল প্রশ্ন। বাস্তবিক, ইহাই হওয়া উচিত আসল প্রশ্ন। নরেশচন্দ্র বলিতেছেন, ইহার সীমা নির্দেশ করিয়া দাও। কিন্তু সুস্পষ্ট সীমারেখা কি ইহার আছে না কি যে, ইচ্ছা করিলেই কেহ আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবে? সমস্তই নির্ভর করে লেখকের শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও শক্তির উপরে। একজনের হাতে যাহা রসের নির্ঝর অপরের হাতে তাহাই কদর্যতায় কালো হইয়া উঠে। শ্লীল, অশ্লীল, আব্রু, বে-আব্রু এ-সকল তর্কের কথা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার আসল উপদেশটি সকল সাহিত্যসেবীরই সবিনয়ে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা উচিত। নর-নারীর যৌন-মিলন যে সকল রস-সাহিত্যের ভিত্তি, এ সত্য কবি অস্বীকার করেন নাই। তথাপি মোট কথাটি বোধ হয় তাঁহার এই যে, ভিত্তির মত ও-বস্তুটি সাহিত্যের গভীর ও গোপন অংশেই থাক। বনিয়াদ যত নীচে এবং যতই প্রচ্ছন্ন থাকে অট্টালিকা ততই সুদৃঢ় হয়।

ততই শিল্পীর ইচ্ছামত তাহাতে কারুকার্য রচনা করা চলে। গাছের শিকড়, গাছের জীবন ও ফুল-ফলের পক্ষে যত প্রয়োজনীয়ই হউক তাহাকে খুঁড়িয়া উপরে তুলিলে তাহার সৌন্দর্যও যায়, প্রাণও শুকায়। এ সত্য যে অভ্রান্ত তাহা ত না বলা চলে না। অবশ্য ঠিক এ জিনিসটিই আধুনিক সাহিত্যে ঘটিতেছে কি না সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র।

নরেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে অনেকগুলি নজির তুলিয়া দিয়া বলিতেছেন—

"শারীর ব্যাপার মাত্রেই তো অপাংক্তেয় নয়, কেন না, চুম্বনের স্থান সাহিত্যে পাকা করিয়া দিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকল সাহিত্য-সম্রাট। আলিঙ্গনও চলিয়া গিয়াছে।"

কিন্তু আলিঙ্গন ত দূরের কথা চুম্বন কথাটাও আমার বইয়ের মধ্যে নিতান্ত বাধ্য না হইলে দিতে পারি না। ওটা পাশ কাটাইতে পারিলেই বাঁচি। নর-নারীর মধ্যে ইহা আছেও জানি, চলেও জানি, দোষেরও বলিতেছি না, তবুও কেমন যেন পারিয়া উঠি না। আমাদের সমাজে এ বস্তুটিকে লোকে গোপন করিতে চাহে বলিয়াই বোধ হয় সুদীর্ঘ সংস্কারে য়ুরোপীয় সাহিত্যের ন্যায় ইহার প্রকাশ্য demonstration-এ লজ্জা করে। খুব সম্ভব আমার দুর্বলতা। কিন্তু ভাবি, এই দুর্বলতা লইয়াই ত অনেক প্রণয়-চিত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি, মুশকিলে ত পড়ি নাই। কাব্য-সাহিত্য এক, কথা-সাহিত্য আর। 'হৃদয়-যমুনা' 'স্তন' 'বিজয়িনী' 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতি কাব্যের মধ্যে যাহাই ঘটুক কথা-সাহিত্যে মনে হয় আমারই মত কবি এ দৌর্বল্য কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। বোধ করি এই সকল এবং এমনি আরও দুই-একটা ছোটখাটো ত্রুটির কথা লোকের মুখে শুনিয়া কবি অতিশয়-ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। 'বিদেশের আমদানি' কথাটা তাঁহার ক্ষোভেরই কথা। দেশভেদে সাহিত্যের ভাষা আলাদা হয়, কিন্তু সত্যকার সাহিত্যের যে দেশ-বিদেশ নাই এ সত্য কবি জানেন। এবং সকলের চেয়ে বেশি করিয়াই জানেন। তা না হইলে আজ বিশ্বসুদ্ধ লোকে তাঁহাকে বিশ্বের কবি বলিয়া মর্যাদা দিত না। কবির সৃষ্টি সমুদ্রের ন্যায় অপরিসীম। নজির আছে জানি, তথাপি সেই সমুদ্র হইতেই স্ব-মতের অনুকূলে নজির তুলিয়া তাঁহাকে খোঁটা দেওয়া শুধু অবিনয় নয়, অন্যায়।

কবি বলিয়াছেন :

"ভারতসাগরের ওপারে (অর্থাৎ য়ুরোপে) যদি প্রশ্ন করা যায় তোমাদের সাহিত্যে এত হট্টগোল কেন? উত্তর পাই, হট্টগোল সাহিত্যের কল্যাণে নয়, হাটেরই কল্যাণে। হাটে

যে ঘিরেছে। ভারতসাগরের এ পারে যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তখন জবাব পাই, হাট ত্রি-সীমানায় নেই বটে, কিন্তু হট্টগোল যথেষ্ট আছে। আধুনিক সাহিত্যের ঐটেই বাহাদুরী।”

এ জবাব কবিকে কে দিয়াছে জানি না, কিন্তু যেই দিয়া থাক আমি তাহার প্রশংসা করিতে পারি না।

নরেশচন্দ্র বলিতেছেন :

“...হাট জমিবার একটু চেষ্টা না হইতেছে এমন নয়। তা ছাড়া হাট জমিবার আগে হট্টগোল সাহিত্যের ইতিহাসে অনেকবার শোনা গিয়াছে। রুশো ও ভল্‌টেয়ার লিখিয়াছিলেন বলিয়াই ফরাসী- বিপ্লবের হাট জমিয়াছিল। এবং আজ বিশ্বব্যাপী ভাব বিনিময়ের দিনে বিলাতে যেটা ঘটিয়াছে, সে সম্বন্ধে আমরা নিরপেক্ষ থাকিতে পারি কি? যে হাট আজ পশ্চিমে বসিয়াছে তাতে আমার সওদা করিবার অধিকার কোনও প্রতীচ্যবাসীর চেয়ে কম নয়।”

আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে এমন স্পষ্ট কথা এমনি নির্ভয়ে আর কেহ বলিয়াছেন কিনা জানি না।

সাহিত্যের নানা কাজের মধ্যে একটা কাজ হইতেছে জাতিকে গঠন করা, সকল দিক দিয়া তাহাকে উন্নত করা। Idea পশ্চিমের কি উত্তরের, ইহা বড় কথা নয়, স্বদেশের কি বিদেশের তাহাও বড় কথা নয়, বড় কথা ইহা ভাষার ও জাতির কল্যাণকর কি না। ‘বিদেশের আমদানি’ কথাটা মুর্গী খাওয়ার অপবাদ নয় যে, শুনিবামাত্রই লজ্জায় মাথা হেঁট করিতে হইবে। অতএব, সাহিত্যিকের শুভবুদ্ধি যদি কল্যাণের নিমিত্তই ইহার আমদানি প্রয়োজনীয় জ্ঞান করে এমন কেহই নাই যে তাহার কণ্ঠরোধ করিতে পারে। যত মতভেদই থাক গায়ের জোরে রুদ্ধ করিবার চেষ্টায় মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই অধিক হয়। কিন্তু এই সকল অত্যন্ত মামুলি কথা কবিকে স্মরণ করাইয়া দিতে আমার নিজেরই লজ্জা

করিতেছে। ইহা যে প্রায় অনধিকারচর্চার কোঠায় গিয়া পড়িতেছে তাহাও সম্পূর্ণ বুঝিতেছি, কিন্তু না বলিয়াও কোন উপায় পাইতেছি না।

এ প্রবন্ধের কলেবর আর অযথা বাড়াইব না। কিন্তু উপসংহারে আরও দুই-একটা সত্য কথা সোজা করিয়াই কবিকে জানাইব। তাঁহার সাহিত্য-ধর্ম প্রবন্ধের শেষ দিকটার ভাষাও যেমন তীক্ষ্ণ শ্লেষও তেমনি নিষ্ঠুর! তিরস্কার করিবার অধিকার একমাত্র তাঁহারই আছে, এ কথা কেহই অস্বীকার করে না, কিন্তু সত্যই কি আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য রাস্তার ধূলা পাঁক করিয়া তুলিয়া পরস্পরের গায়ে নিক্ষেপ করাটাকেই সাহিত্য-সাধনা জ্ঞান করিতেছে? হয়ত, কখনো কোথাও ভুল হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত আধুনিক সাহিত্যের প্রতি এত বড় দণ্ডই কি সুবিচার হইয়াছে?

কবি বলিয়াছেন :

"সে দেশের সাহিত্য অন্ততঃ বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে এই দৌরাত্ম্যের কৈফিয়ৎ দিতে পারে। কিন্তু যে দেশে অন্তরে-বাহিরে, বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনখানেই প্রবেশাধিকার পায়নি...। "

এই যদি সত্য হইয়া থাকে ত ভারতের দুঃখের কথা, দুর্ভাগ্যের কথা। হয়ত প্রবেশাধিকার পায় নাই, হয়ত এ বস্তু সত্যই ভারতে ছিল না, কিন্তু কোন একটা জিনিস শুধু কেবল ছিল না বলিয়াই কি চিরদিন বর্জিত হইয়া থাকিবে? ইহাই কি তাঁহার আদেশ?

পরের লাইনে কবি বলিয়াছেন :

"সে দেশের (অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশের) সাহিত্যে ধার করা নকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দিবে?"

দোহাই দেওয়া প্রয়োজন নাই, চাপা দেওয়াও অন্যায়, কিন্তু ভক্তের মুখের ধার-করা অভিমতটাকেই অসংশয়ে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাতেই কি ন্যায়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না?

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য-ধর্মে'র জবাব দিয়াছেন নরেশচন্দ্র। হয়ত তাঁহার ধারণা অনেকের মত তিনিও একজন কবির লক্ষ্য। এ ধারণার হেতু কি আছে আমি জানি না। তাঁহার সকল বই আমি পড়ি নাই, মাসিকের পৃষ্ঠায় যাহা প্রকাশিত হয় তাহাই শুধু দেখিয়াছি। মতের একতা অনেক জায়গায় অনুভব করি নাই। কখনো মনে হইয়াছে নর-নারীর প্রেমের ব্যাপারে তিনি প্রচলিত সুনির্দিষ্ট রাস্তা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখানেও নিজের মতকেই অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করি নাই। নরেশচন্দ্রের প্রতি অনেকেই প্রসন্ন নহেন জানি। কিন্তু, মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে মাধুর্যহীন রুঢ়তাকেই শক্তির লক্ষণ মনে করিয়া পালোয়ানির মাতামাতি করিতেই তিনি বই লেখেন এমন অপবাদ আমি দিতে পারি না। তাঁহার সহিত পরিচয় আমার নাই, কখনও তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়াও স্মরণ হয় না, কিন্তু পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে,ভাষার অধিকারে, চিন্তার বিস্তারে এবং সর্বোপরি স্বাধীন অভিমতের অকুণ্ঠিত প্রকাশে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার সমতুল্য লেখক অল্পই আছেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অবিসংবাদী বিচারক হিসাবে কবির কর্তব্য ইঁহার সমগ্র পুস্তক পাঠ করা, কোথায় বা শীলতার অভাব, কোথায় বা কাব্যলক্ষ্মীর বস্ত্রহরণে ইনি নিযুক্ত, স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেওয়া। তবে এমনও হইতে পারে কবির লক্ষ্য নরেশচন্দ্র নহেন, আর কেহ। কিন্তু সেই 'আর কেহ'রও সব বই তাঁহার পড়িয়া দেখা উচিত বলিয়া মনে করি। নিজের সাহিত্যিক জীবনের কথা মনে পড়ে। এই ত সেদিনের কথা—গালিগালাজের আর অন্ত ছিল না। অনেক লিখিয়াছি, সকলকে খুশী করিতে পারি নাই, ভুল করিয়াছিও বিস্তর। কিন্তু একটা ভুল করি নাই। স্বভাবতঃ নিরীহ শান্তিপ্রিয় লোক বলিয়াই হউক, বা অক্ষমতাবশতঃই হউক, আক্রমণের উত্তরও দিই নাই। কাহাকে আক্রমণও করি নাই। বহুকাল হইয়া গেলেও, কবির নিজের কথাও হয়ত মনে পড়িবে। সংসারে চিরদিনই কিছু কিছু লোক থাকে যাহারা সাহিত্যের এই দিকটাই পছন্দ করে। এখন বুড়া হইয়াছি, মরিবার দিন আসন্ন হইয়া উঠিল, গালমন্দ আর বড় খাই না। শুধু 'পথের দাবী' লিখিয়া

সেদিন 'মানসী' পত্রিকার মারফতে এক রায়সাহেব সাবডেপুটির ধমক খাইয়াছি। বইয়ের মধ্যে কোথায় নাকি সোনাগাছির ইয়ারকি ছিল, অভিজ্ঞ ব্যক্তির চক্ষে তাহা ধরা পড়িয়া গিয়াছিল। সে যাই হউক, আমাদের দিন গত হইতে বসিয়াছে। এখন একদল নবীন সাহিত্য-ব্রতী সাহিত্যসেবার ভার গ্রহণ করিতেছেন। সর্বান্তঃকরণে আমি তাঁহাদের আশীর্বাদ করি। এবং যে-কয়টি দিন বাঁচিব শুধু এই কাজটুকুই নিজের হাতে রাখিব।

কিন্তু কিছুদিন হইতে দেখিতেছি ইঁহাদের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড অভিযান শুরু হইয়াছে।

ক্ষমা নাই, ধৈর্য নাই, বন্ধুভাবে ভ্রম সংশোধনের বাসনা নাই, আছে শুধু কটূক্তি আছে শুধু সুতীব্র বাক্যশেলে ইঁহাদের বিদ্ধ করিবার সঙ্কল্প। আছে শুধু দেশের ও দশের কাছে ইঁহাদের হেয় প্রতিপন্ন করিবার নির্দয় বাসনা। মনের অনৈক্য মাত্রেই বাণীর মন্দিরে সেবকদিগের এই আত্মঘাতী কলহে না আছে গৌরব, না আছে কল্যাণ।

বিশ্বকবির এই 'সাহিত্য-ধর্মে'র শেষের দিকটা আমি সবিনয়ে প্রতিবাদ করি। ভাগ্যদোষে আমার প্রতি তিনি বিরূপ, আমার কথা হয়ত তিনি বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, কিন্তু তাঁহাকে সত্যই নিবেদন করিতেছি যে, বাঙ্গালা সাহিত্যসেবীদের মাঝে এমন কেহই নাই যে তাঁহাকে মনে মনে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নাই, আধুনিক সাহিত্যের অমঙ্গল আশঙ্কায় যাহারা তাঁহার কানের কাছে 'গুরুদেব' বলিয়া অহরহ বিলাপ করিতেছে, তাহাদের কাহারও চেয়েই ইহারা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধায় খাটো নহে।

———

('বঙ্গবাণী' ১৩৩৪ আশ্বিন সংখ্যা হইতে গৃহীত।)

অভিভাষণ

বন্ধুজনের সমাদর, স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠদের প্রীতি এবং পূজনীয়গণের আশীর্বাদ আমি সবিনয়ে গ্রহণ করলাম। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা পাওয়া কঠিন। নিজের জন্য শুধু এই প্রার্থনা করি, আপনাদের হাত থেকে যে মর্যাদা আজ পেলাম, এর চেয়েও এ জীবনে বড় আর কিছু যেন কামনা না করি। যে মানপত্র এইমাত্র পড়া হোল, তা আকারে যেমন ছোট, আন্তরিক সহৃদয়তায় তেমনি বড়। এ তার প্রত্যুত্তর নয়; এ শুধু আমার মনের কথা, তাই আমারও বক্তব্যটুকু আমি ক্ষুদ্র করেই লিখে এনেছি।

এই যে অনুরাগ, এই যে আমার জন্মতিথিকে উপলক্ষ করে আনন্দ প্রকাশের আয়োজন—আমি জানি, এ আমার ব্যক্তিকে নয়। দরিদ্র গৃহে আমার জন্ম, এই ত সেদিনও দূর প্রবাসে তুচ্ছ কাজে জীবিকা অর্জনেই ব্যাপৃত ছিলাম; সেদিন পরিচয় দিবার আমার কোন সঞ্চয়ই ছিল না। তাই ত বুঝতে আজ বাকী নেই—এ শ্রদ্ধা নিবেদন কোন বিত্তকে নয়, বিদ্যাকে নয়, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কোন অতীত দিনের গৌরবকে নয়, এ শুধু আমাকে অবলম্বন করে সাহিত্য-লক্ষ্মীর পদতলে ভক্ত মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদন।

জানি এ সবই। তবুও যে সংশয় মনকে আজ আমার বারংবার নাড়া দিয়ে গেছে সে এই যে, সাহিত্যের দিক দিয়েই এ মর্যাদার যোগ্যতা কি আমি সত্যই অর্জন করেছি? কিছুই করিনি এ কথা আমি বলব না। কারণ এতবড় অতি-বিনয়ের অত্যুক্তি দিয়ে উপহাস করতে আমি নিজেকেও চাইনে, আপনাদেরও না। কিছু আমি করেছি। বন্ধুরা বলবেন শুধু কিছু নয়, অনেক কিছু। তুমি অনেক করেছ। কিন্তু তাঁদের দলভুক্ত যাঁরা নন, তাঁরা হয়ত একটু হেসে বলবেন, অনেক নয়, তবে সামান্য কিছু করেছেন, এইটিই সত্য এবং আমরাও তাই মানি। কিন্তু তাও বলি যে, সে সামান্যের ঊর্ধ্বস্থ বুদ্বুদ্, আর অধঃস্থ আবর্জনা বাদ দিলে অবশিষ্ট যা থাকে কালের বিচারালয়ে তার মূল্য লোভের বস্তু নয়। এ যাঁরা বলেন আমি তাঁদের প্রতিবাদ করিনে, কারণ তাঁদের কথা যে সত্য নয়, তা কোন মতেই

জোর করে বলা চলে না। কিন্তু এর জন্যে আমার দুশ্চিন্তাও নেই। যে কাল আজও আসেনি, সেই অনাগত ভবিষ্যতে আমার লেখার মূল্য থাকবে, কি থাকবে না, সে আমার চিন্তার অতীত। আমার বর্তমানেরই সত্যোপলব্ধি যদি ভবিষ্যতের সত্যোপলব্ধির সঙ্গে এক হয়ে মিলতে না পারে পথ তাকে ত ছাড়তেই হবে। তার আয়ুষ্কাল যদি শেষ হয়েই যায় সে শুধু এই জন্যেই যাবে যে, আরও বৃহৎ, আরও সুন্দর, আরও পরিপূর্ণ সাহিত্যের সৃষ্টিকার্যে তার কঙ্কালের প্রয়োজন হয়েছে। ক্ষোভ না করে বরঞ্চ এই প্রার্থনাই জানাবো যে, আমার দেশে, আমার ভাষায় এতবড় সাহিত্যই জন্মলাভ করুক যার তুলনায় আমার লেখা যেন একদিন অকিঞ্চিৎকর হয়েই যেতে পারে।

নানা অবস্থা বিপর্যয়ে একদিন নানা ব্যক্তির সংশ্রবে আসতে হয়েছিল। তাতে ক্ষতি যে কিছু পৌঁছায় নি তা নয়, কিন্তু সেদিন দেখা যাদের পেয়েছিলাম, তারা সকল ক্ষতিই আমার পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। তারা মনের মধ্যে এই উপলব্ধিটুকু রেখে গেছে, ত্রুটি, বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ—তাকে আত্মা বলা যেতেও পারে—সে তার সকল অভাব, সকল অপরাধের চেয়েও বড়। আমার সাহিত্য-রচনায় তাকে যেন অপমান না করি। হেতু যত বড়ই হোক, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায় আমার লেখা কোন দিন যেন না এত বড় প্রশ্রয় পায়। কিন্তু অনেকেই তা আমার অপরাধ বলে গণ্য করেছেন, এবং যে অপরাধে আমি সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা পেয়েছি, সে আমার এই অপরাধ। পাপীর চিত্র আমার তুলিতে মনোহর হয়ে উঠেছে, আমার বিরুদ্ধে তাঁদের সবচেয়ে বড় এই অভিযোগ।

এ ভাল কি মন্দ আমি জানিনে, এতে মানবের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ অধিক হয় কি না এ বিচার করেও দেখিনি—শুধু সেদিন যাকে সত্য বলে অনুভব করেছিলাম তাকেই অকপটে প্রকাশ করেছি। এ সত্য চিরন্তন ও শাশ্বত কি না এ চিন্তা আমার নয়, কাল যদি সে মিথ্যা হয়েও যায়—তা নিয়ে কারো সঙ্গে আমি বিবাদ করতে যাব না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা আমার সর্বদাই মনে হয়। হঠাৎ শুনলে মনে ঘা লাগে, তথাপি এ কথা সত্য বলেই বিশ্বাস করি যে, কোন দেশের কোন সাহিত্যই কখনো নিত্যকালের হয়ে থাকে না। বিশ্বের সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মত তারও জন্ম আছে, পরিণতি আছে, বিনাশের ক্ষণ আছে। মানুষের মন ছাড়া ত সাহিত্যের দাঁড়াবার জায়গা নেই, মানব-চিত্তেই ত তার আশ্রয়, তার সকল ঐশ্বর্য বিকশিত হয়ে উঠে। মানবচিত্তই যে একস্থানে নিশ্চল হয়ে থাকতে পায় না! তার পরিবর্তন আছে, বিবর্তন আছে—তার রসবোধ ও সৌন্দর্য বিচারের ধারার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তাই এক যুগে যে মূল্য মানুষে খুশী হয়ে দেয়, আর এক যুগে তার অর্ধেক

দাম দিতেও তার কুণ্ঠার অবধি থাকে না।

মনে আছে দাশু রায়ের অনুপ্রাসের ছন্দে গাঁথা দুর্গার স্তব পিতামহের কণ্ঠহারে সেকালে কত বড় রত্নই না ছিল! আজ পৌত্রের হাতে বাসি মালার মত তারা অবজ্ঞাত। অথচ এতখানি অনাদরের কথা সেদিন কে ভেবেছিল?

কিন্তু কেন এমন হয়? কার দোষে এমন ঘটল? সেই অনুপ্রাসের অলঙ্কার ত আজও তেমনি গাঁথা আছে। আছে সবই, নেই শুধু তাকে গ্রহণ করবার মানুষের মন। তার আনন্দবোধের চিত্ত আজ দূরে সরে গেছে। দাশু রায়ের নয়, তার কাব্যেরও নয়, দোষ যদি কোথাও থাকে ত সে যুগধর্মের।

তর্ক উঠতে পারে, শুধু দাশু রায়ের দৃষ্টান্ত দিলেই ত চলে না। চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব পদাবলী ত আজও আছে, কালিদাসের শকুন্তলা ত আজও তেমনি জীবন্ত। তাতে শুধু এইটুকুই প্রমাণিত হয় যে, তার আয়ুষ্কাল দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ। কিন্তু এর থেকে তার অবিনশ্বরতাও সপ্রমাণ হয় না। তার দোষ-গুণেরও শেষ নিষ্পত্তি করা যায় না।

সমগ্র মানব জীবনে কেন, ব্যক্তিবিশেষের জীবনেও দেখি এই নিয়মই বিদ্যমান। ছেলেবেলায় আমার 'ভবানী পাঠক' ও 'হরিদাসের গুপ্তকথা'ই ছিল একমাত্র সম্বল। তখন

কত রস, কত আনন্দই যে এই দুইখানি বই থেকে উপভোগ করেছি, তার সীমা নেই। অথচ, আজ সে আমার কাছে নীরস। কিন্তু এ গ্রন্থের অপরাধ, কি আমার বৃদ্ধত্বের অপরাধ বলা কঠিন। অথচ এমনই পরিহাস, এমনই জগতের বদ্ধমূল সংস্কার যে, কাব্য উপন্যাসের ভালমন্দ বিচারের শেষ ভার গিয়ে পড়ে বৃদ্ধদের পরেই। কিন্তু এ কি বিজ্ঞান ইতিহাস? এ কি শুধু কর্তব্য কার্য, শুধু শিল্প যে, বয়সের দীর্ঘতাই হবে বিচার করবার সবচেয়ে বড় দাবী?

বার্ধক্যে নিজের জীবন যখন বিস্বাদ, কামনা যখন শুষ্কপ্রায়, ক্লান্তি অবসাদে জীর্ণ দেহ যখন ভারাক্রান্ত,—নিজের জীবন যখন রসহীন, বয়সের বিচারে যৌবন কি বার বার দ্বারস্থ হবে গিয়ে তারই?

ছেলেরা গল্প লিখে নিয়ে গিয়ে যখন আমার কাছে উপস্থিত হয়, তারা ভাবে এই বুড়ো লোকটার রায় দেওয়ার অধিকারই বুঝি সবচেয়ে বেশি। তারা জানে না যে, আমার নিজের যৌবনকালের রচনারও আজ আমি আর বড় বিচারক নই।

তাদের বলি, তোমাদের সম-বয়সের ছেলেদের গিয়ে দেখাও। তারা যদি আনন্দ পায়, তাদের যদি ভালো লাগে, সেইটিই জেনো সত্য বিচার।

তারা বিশ্বাস করে না, ভাবে দায় এড়াবার জন্যই বুঝি এ কথা বলচি—তখন নিঃশ্বাস ফেলে ভাবি, বহু যুগের সংস্কার কাটিয়ে উঠাই কি সোজা? সোজা নয় জানি, তবুও বলব, রসের বিচারে এইটেই সত্য বিচার।

বিচারের দিক থেকে যেমন, সৃষ্টির দিক থেকেও ঠিক এই এক বিধান। সৃষ্টির কালটাই হলো যৌবনকাল—কি প্রজা সৃষ্টির দিক দিয়ে, কি সাহিত্য সৃষ্টির দিক দিয়ে | এই বয়স অতিক্রম করে' মানুষের দূরের দৃষ্টি হয়ত ভীষণতর হয়, কিন্তু কাছের দৃষ্টি তেমনি ঝাপসা হয়ে আসে। প্রবীণতার পাকা বুদ্ধি দিয়ে তখন নীতিপূর্ণ কল্যাণকর বই লেখা চলে কিন্তু

আত্মভোলা যৌবনের প্রস্রবণ বেয়ে যে রসের বস্তু ঝরে পড়ে, তার উৎসমুখ রুদ্ধ হয়ে যায়। আজ তিপ্পান্ন বছরে পা দিয়ে আমার এই কথাটাই আপনাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই,—অতঃপর রসের পরিবেশনে ত্রুটি যদি আপনাদের চোখে পড়ে, নিশ্চয় জানবেন তার সকল অপরাধ আমার এই তিপ্পান্ন বছরের।

আজ আমি বৃদ্ধ, কিন্তু বুড়ো যখন হইনি, তখন পূজনীয়গণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অনেকের সাথে ভাষা-জননীর পদতলে যেটুকু অর্ঘ্যের যোগান দিয়েছি, তার বহুগুণ মূল্য আজ দুই হাত পূর্ণ করে আপনারা ঢেলে দিয়েছেন। কৃতজ্ঞ চিত্তে আপনাদের নমস্কার করি।

(১৩৩৫ সালের ভাদ্র মাসে ৫৩তম বাৎসরিক জন্মদিন উপলক্ষে ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউটে দেশবাসী প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তর।)

অভিভাষণ

আবার একটা বছর গড়িয়ে গেল। জন্মদিন উপলক্ষে সে দিনও এমনই আপনাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, সে দিনও এমনি স্নেহ, প্রীতি ও সমিতির একান্ত শুভ কামনায় আজকের মতই হৃদয় পরিপূর্ণ করে'নিয়েছিলুম, শুধু দেশের অত্যন্ত দুর্দিন স্মরণ করে তখন আপনাদের উৎসবের বাহ্যিক আয়োজনকে সঙ্কুচিত করতে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। হয়ত আপনারা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু অনুরোধ উপেক্ষা করেন নি, সে কথা আমার মনে আছে। দুর্দিন আজও অপগত হয়নি, বরঞ্চ শতগুণে বেড়েচে, এবং কবে যে তার অবসান ঘটবে তাও চোখে পড়ে না, কিন্তু সেই দুর্দশাকেই সব চেয়ে উচ্চস্থান দিয়ে শোকাচ্ছন্ন স্তব্ধতায় জীবনের অন্যান্য আহ্বান

অনির্দিষ্টকাল, অবহেলা করতেও মন আর চায় না। আজ তাই আপনাদের আমন্ত্রণে শ্রদ্ধানত চিত্তে এসে উপস্থিত হয়েছি।

শুনেছি সমিতির প্রার্থনায় কবিগুরু একটুখানি লিখন পাঠিয়েছেন, Liberty-তে তার ইংরেজী তর্জমা প্রকাশিত হয়েছে। তার শেষের দিকে আমার অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য-সেবার অপ্রত্যাশিত পুরস্কার আছে। এ আমার সম্পদ। তাঁকে নমস্কার জানাই, এবং সমিতির হাত দিয়ে একে পেলাম বলে আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এই লেখাটুকুর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালার কথা-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের একটুখানি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। বিস্তারিত বিবরণও নয়, দোষগুণের সমালোচনাও নয়, কিন্তু এরই মধ্যে চিন্তা করার, আলোচনা করার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ দিক্-নির্ণয়ের পর্যাপ্ত উপাদান নিহিত আছে। কবি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠের' উল্লেখ করে বলেছেন, 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' তুলনায় এর সাহিত্যিক মূল্য সামান্যই। এর মূল্য স্বদেশ-হিতৈষণায়, –মাতৃভূমির দুঃখ-দুর্দশার বিবরণে, তার প্রতিকারের উপায় প্রচারে, তার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি আকর্ষণে। অর্থাৎ, 'আনন্দমঠে' সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের সিংহাসন

জুড়ে বসেছে প্রচারক ও শিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে এমন কথা, বোধ করি এর পূর্বে আর কেউ বলতে সাহস করেনি।

এবং এ কথাও হয়ত নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, কথা-সাহিত্যের ব্যাপারে এই হচ্চে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত অভিমত। এই অভিমত সবাই গ্রাহ্য করতে পারবে কিনা জানিনে, কিন্তু যারা পারবে, উত্তরকালে তাদের গন্তব্য পথের সন্ধান এইখানে পাওয়া গেল। এবং যারা পারবে না তাদেরও একান্ত শ্রদ্ধায় মনে করা ভালো যে, এ উক্তি রবীন্দ্রনাথের—যাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা ও instinct প্রায় অপরিমেয় বলা চলে।

গল্প, উপন্যাস ও কবিতায় স্বদেশের দুঃখের কাহিনী, অনাচার-অত্যাচারের কাহিনী কি করে যে লেখকের অন্যান্য রচনা ছায়াচ্ছন্ন করে দেয় আমি নিজেও তা জানি, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি সভায় গিয়েও তা অনুভব করে এসেচি। বছর-কয়েক পূর্বে কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম সাহিত্য-সভায় একবার উপস্থিত হতে পেরেছিলাম। দেখলাম তাঁর মৃত্যুর দিন স্মরণ করে বহু মনীষী, বহু পণ্ডিত, বহু সাহিত্য-রসিক বহু স্থান থেকে সভায় সমাগত হয়েছেন, বক্তার পরে বক্তা—সকলের মুখেই ঐ এক কথা,—বঙ্কিম ‘বন্দেমাতরম’-মন্ত্রের ঋষি, বঙ্কিম মুক্তি-যজ্ঞে প্রথম পুরোহিত। সকলের সমবেত শ্রদ্ধাঞ্জলি গিয়ে পড়লো একা ‘আনন্দমঠে’র ‘পরে। ‘দেবী চৌধুরানী’, ‘কৃষ্ণচরিতের’ উল্লেখ কেউ কেউ করলেন বটে, কিন্তু কেউ নাম করলেন না ‘বিষবৃক্ষে’র কেউ স্মরণ করলেন না একবার ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’কে। ঐ দু’টো বই যেন পূর্ণ চন্দ্রের কলঙ্ক, ওর জন্যে যেন মনে মনে সবাই লজ্জিত। তারপরে প্রত্যেক সাহিত্য-সম্মিলনীর যা অবশ্য কর্তব্য অর্থাৎ আধুনিক সাহিত্যসেবীদের নির্বিচারে ও প্রবলকণ্ঠে ধিক্কার দিয়ে, সাহিত্যগুরু বঙ্কিমের স্মৃতি সভার পুণ্যকার্য সে দিনের মতো সমাপ্ত হলো। এমনিই হয়।

কিন্তু একটা কথা রবীন্দ্রনাথ বলেন নি। বঙ্কিমের ন্যায় অতবড় সাহিত্যিক প্রতিভা, যিনি তখনকার দিনেও বাঙ্গলা ভাষার নবরূপ, নবকলেবর সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, ‘বিষবৃক্ষ’ ও ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’—বঙ্গ সাহিত্যের মহামূল্য সম্পদ দু’টি যিনি বাঙ্গালীকে

দান করতে পেরেছিলেন, কিসের জন্য তিনি পরিণত বয়সে কথা-সাহিত্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করে আবার 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম' লিখতে গেলেন? কোন্ প্রয়োজন তাঁর হয়েছিল? কারণ, এ কথা ত নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে স্বকীয় মত প্রচার তাঁর কাছে কঠিন ছিল না। আশা আছে রবীন্দ্রনাথ হয়ত কোনদিন এ সমস্যার মীমাংসা করে দেবেন। আজ সকল কথা তাঁর বুঝিনি, কিন্তু সে দিন হয়ত আমার নিজের মীমাংসাও এর মধ্যেই খুঁজে পাবো।

কবি তাঁর বাল্যজীবনের একটা ঘটনার উল্লেখ করেছেন, সে তাঁর চোখের দৃষ্টি-শক্তির ক্ষীণতা। এ তিনি জানতেন না। তাই, দূরের বস্তু যখন স্পষ্ট করে দেখতে পেতেন না, তার জন্যে মনের মধ্যে কোন অভাববোধও ছিল না। এটা বুঝলেন চোখে চশমা পরার পরে। এবং এর পরে চশমা ছাড়াও আর গতি ছিল না। এমনিই হয়—এ-ই সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম। বাঙ্গালার শিক্ষিত মন কেন যে 'বিজয় বসন্তের' মধ্যে তার রসোপলব্ধির উপাদান আর খুঁজে পায় না, এই তার কারণ। এবং মনে হয় আধুনিক-সাহিত্য-বিচারেও এই সত্যটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাহিত্য-রচনায় আর যাই কেন না হোক, শ্লীলতা, শোভনতা, ভদ্ররুচি ও মার্জিত মনের রসোপলব্ধিকে অকারণ দাম্ভিকতায় বারংবার আঘাত করতে থাকলে বাঙ্গালা সাহিত্যের যত ক্ষতিই হউক, তাঁদের নিজেদের ক্ষতি হবে তার চেয়েও অনেক বেশি। সে আত্মহত্যারই নামান্তর।

বলবার হয়ত অনেক কিছু আছে, কিন্তু আজকের দিনে আমি সাহিত্য-বিচারে প্রবৃত্ত হব না।

শেষেরটা একটা নিবেদন। শ্রদ্ধা ও স্নেহের অভিনন্দন মন দিয়ে গ্রহণ করতে হয়, তার জবাব দিতে নেই।

আপনারা আমার পরিপূর্ণ হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

(৫৫তম বাৎসরিক জন্মতিথিতে প্রেসিডেন্সি কলেজে বঙ্কিম-শরৎ সমিতি প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে পঠিত।)

যতীন্দ্র-সম্বর্ধনা

সামতাবেড়. পানিত্রাস
জেলা হাবড়া

কল্যাণীয়েষু,–

ভাই কালিদাস, তোমার চিঠি পেলাম। আমার একটা দুর্নাম আছে যে, আমি জবাব দিইনে। নেহাৎ মিথ্যে বলতে পারিনে, কিন্তু যে বিষয়টি নিয়ে তুমি নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছো তারও যদি সাড়া না দিই ত শুধু যে অসৌজন্যের অপরাধ হবে তাই নয়,কোন দিক থেকেই যে যতীনকে সমাদর করবার অংশ নিতে পারলাম না যে দুঃখের অবধি থাকবে না। অনেকেই জানে না যে, যতীনকে আমি সত্যই ভালোবাসি। শুধু কেবল কবি বলে নয়, তাঁর ভেতরে এমনি একটি স্নেহ-সরস, বন্ধু-বৎসল, ভদ্র মন আছে যে, তার স্পর্শে নিজের মনটাও তৃপ্তিতে ভরে আসে।

যতীন জানেন, আমি তাঁর কবিতার একান্ত অনুরাগী। যখন যেখানেই তাদের দেখা পাই, বার বার করে পড়ি। স্নিগ্ধ সকরুণ নির্ভুল ছন্দগুলি কানে কানে যেন কত-কি বলতে থাকে।

কারও সম্বন্ধেই নিজের অভিমত আমি সহজে প্রকাশ করিনে, আমার সঙ্কাচ বোধ হয়। ভাবি, আমার মতামতের মূল্যই বা কি, কিন্তু যদি কখনো বলতেই হয় ত সত্যি কথাই বলি! যতীনকে স্নেহ করি, কিন্তু স্নেহের অতিশয়োক্তি দিয়ে তাঁকেও খুশী করতে পারতাম না সত্যি না হলে। যাক এ কথা।

তোমাদের অনুষ্ঠানটি ছোট;–হবেই ত ছোট। কিন্তু তাই বলে তার দামটি ছোট নয়।

এ ত ঢেঁটরা দিয়ে বহুলোক ডেকে এনে উচ্চ কোলাহলে "জয়, যতীন বাগচী কী জয়!" বলার ব্যাপার নয়, এ তোমাদের ছোট্ট রসচক্রের প্রীতি-সম্মিলন। অর্থাৎ, কোন একটি বিশেষ দিনে ও বিশেষ স্থানে জন-কয়েক সত্যিকার সাহিত্য-রসিক ও সাহিত্য-সেবী এক সঙ্গে মিলে আর একজন সত্যিকার সাহিত্য-সেবককে সাদরে আহ্বান করে এনে বলা—"কবি, আমরা তোমার সাহিত্য-সাধনায় আনন্দলাভ করেচি, তোমার বাণীপূজা সার্থক হয়েছে,—তুমি সুখী হও, তুমি দীর্ঘায়ুঃ হও, আমরা তোমাকে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিই—তুমি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ কর।" এই ত? আয়োজন সামান্য বলে তোমরা ক্ষুণ্ণ হোয়ো না।

কিন্তু তবুও সম্মিলনে একটুখানি ত্রুটি ঘটলো,—আমি যেতে পারলাম না। কারণ আমি বোধ করি তোমাদের সকলের চেয়ে বয়সে বড়।

এ অঞ্চলটায় ব্যারাম-স্যারাম নেই, কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে হতভাগ্য ডেঙ্গু এসে জুটেচে। সকাল থেকে ছোট ছেলেমেয়ে-দুটির চোক ছলছল করচে, চাকর জন-দুই ছাড়া সবাই বিছানা নিয়েছে, আমার এক নাক বন্ধ, অন্যটায় টিউব-ওয়েলের লীলা শুরু হয়েছে, রাত্রি নাগাদ বোধ হয় দেহ-মন-প্রাণ উৎসবে যোগ দিবেন, আভাস-ইশারায় তার খবর পৌঁছোচ্চে। নইলে এ অনুষ্ঠানে আমার নামে তোমাকে গর-হাজিরির ঢ্যারা টানতে দিতাম না।

অনেকে উপস্থিত আছো, এই সুযোগে একটা দুঃখের অনুযোগ জানাই। কালিদাস, তুমিও তো প্রায় সাবালক হতে চললে। আগেকার দিনের সকল কথা তোমার স্মরণ না থাকলেও কিছু কিছু হয়ত মনে পড়বে, এ দিনের মত সেদিনে আমরা এমন করে পরস্পরের ছিদ্র খুঁজে বেড়াতাম না, এক-আধটা ব্যতিক্রম হয়ত ঘটেচে, কিন্তু এখনকার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না।

সাহিত্য-সেবকদের মাঝখানে ভাবের আদান-প্রদান, একের কাছে অপরের দেওয়া এবং পাওয়া চিরদিনই চলে আসচে এবং চিরদিনই চলবে। কিন্তু তরুণ দলের মধ্যে আজকাল এ কি হতে চললো? নিন্দে করার এ কি উদ্দাম উৎসাহ, গ্লানি প্রচারের এ কি নির্দয় অধ্যবসায়! কেবলি একজন আর একজনকে চোর প্রতিপন্ন করতে চায়। খবরের কাগজে কাগজে যত দেখি ততই যেন মন লজ্জায় দুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে আসে। ক্ষমা নেই, ধৈর্য নেই, বেদনা বোধ নেই, হানাহানির নিষ্ঠুরতার যেন শেষ হতেই চায় না। কোথায় কার সঙ্গে কতটুকু মিলচে, কার লেখা থেকে কে কতটুকু নকল করেচে, রুক্ষ কটুকণ্ঠে এই খবরটা বিশ্বের দরবারে ঘোষণা করে যে এরা কি সান্ত্বনা অনুভব করে আমি ভেবেই পাইনে। ঘরে বাইরে কেবলি জানাতে চায় যে বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যিকদের বিদেশের চুরি-করা ছাড়া আর কোন সম্বলই নেই।

যতীনকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে অতি পরিশ্রমে খুঁজে খুঁজে এই গোয়েন্দাগিরির কাজটা তখনও আমাদের সাহিত্যিক মহলে প্রচলিত হয় উঠেনি! যাই হোক কামনা করি তোমাদের রসচক্রের রসিকদের মধ্যে যেন এ ব্যাধি কখনও প্রবেশ করবার দরজা খুঁজে না পায়।

কবি নই, মনের মধ্যে কথা জমে উঠলেও তোমাদের মত প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাইনে, গুছিয়ে বলা হয় না। তাই চিঠি লেখা হয়ে যায় আমার চিরদিনই এলোমেলো।

তা হোক গে এলোমেলো, তবু এমনি করেই বলি, তোমাদের রসচক্রের জয় হোক, তোমাদের আজকের আয়োজন সফল হোক, এবং যতীনকে বোলো শরৎদা তাঁকে এই চিঠির মারফৎ স্নেহাশীর্বাদ পাঠিয়েছেন। ইতি—৫ই ভাদ্র, ১৩৩৮।

শরৎদা।

(কলকাতার সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সংস্থা ‘রসচক্রের’ পক্ষ থেকে কবি যতীন্দ্রনাথ বাগচীকে সম্বর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা হলে, শরৎচন্দ্র তখন রসচক্রের সম্পাদক কবি কালিদাস রায়কে এই চিঠিটি লিখেছিলেন।)

শেষ প্রশ্ন

কল্যাণীয়াসু,–

হাঁ, 'শেষ প্রশ্ন' নিয়ে আন্দোলনের ঢেউ আমার কানে এসে পৌঁচেছে। অন্ততঃ, যেগুলি অতিশয় তীব্র এবং কটু সেগুলি যেন না দৈবাৎ আমার চোখ কান এড়িয়ে যায়, যাঁরা অত্যন্ত শুভানুধ্যায়ী তাঁদের সেদিকে প্রখর দৃষ্টি। লেখাগুলি সযত্নে সংগ্রহ করে লাল-নীল-সবুজ-বেগনী নানা রঙের পেন্সিলে দাগ দিয়ে, তাঁরা ডাকের মাশুল দিয়ে অত্যন্ত সাবধানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এবং পরে আলাদা চিঠি লিখে খবর নিয়েছেন পৌঁছল কিনা। তাঁদের আগ্রহ, ক্রোধ ও সমবেদনা হৃদয় স্পর্শ করে।

নিজে তুমি কাগজ পাঠাও নি বটে, কিন্তু তাই বলে রাগও কম করোনি। সমালোচকের চরিত্র, রুচি, এমন কি পারিবারিক জীবনকেও কটাক্ষ করেছো। একবারও ভেবে দেখোনি যে শক্ত কথা বলতে পারাটাই সংসারে শক্ত কাজ নয়! মানুষকে অপমান করায় নিজের মর্যাদাই আহত হয় সব চেয়ে বেশি। জীবনে এ যারা ভোলে তারা একটা বড় কথাই ভুলে থাকে। তা ছাড়া এমন ত হতে পারে 'পথের দাবী' এবং 'শেষ প্রশ্ন' এর সত্যিই খুব খারাপ লেগেছে। পৃথিবীতে সব বই সকলের জন্যে নয়,–সকলেরই ভাল লাগবে এবং প্রশংসা করতে হবে এমন ত কোন বাঁধা নিয়ম নেই। তবে, সেই কথাটা প্রকাশ করার ভঙ্গীটা ভালো হয়নি, এ আমি মানি। ভাষা অহেতুক রূঢ় এবং হিংস্র হয়ে উঠেছে, কিন্তু এইটেই ত রচনা-রীতির বড় সাধনা।

মনের মধ্যে ক্ষোভ ও উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও যে ভদ্রব্যক্তির অসংযত ভাষা প্রয়োগ করা চলে না, এই কথাটাই অনেক দিনে অনেক দুঃখে আয়ত্ত করতে হয়। তোমার চিঠির মধ্যে এ ভুল তুমি তাঁর চেয়েও করেছো। এতবড় আত্ম-অবমাননা আর নেই।

ভাবে বোধ হয় তুমি অল্প দিনই কলেজ ছেড়েচো। লিখেচো তোমার সখীদেরও এমনি মনোভাব। যদি হয় সে দুঃখের কথা। এ লেখা যদি তোমার হাতে পড়ে তাঁদের দেখিয়ো। শীলতা মেয়েদের বড় ভূষণ, এ সম্পদ কারো জন্যে, কোন কিছুর জন্যেই তোমাদের ক্ষোয়ানো চলে না।

জানতে চেয়েছো আমি এ সকলের জবাব দিইনি কেন? এর উত্তর—আমার ইচ্ছে করে না, কারণ ও আমার কাজ নয়—আত্মরক্ষার ছলেও মানুষের অসম্মান করা আমার ধাতে পোষায় না। দেখো না লোকে বলে আমি পতিতাদের সমর্থন করি। সমর্থন আমি করিনে, শুধু অপমান করতেই মন চায় না। বলি, তারাও মানুষ, তাদেরও নালিশ জানাবার অধিকার আছে, এবং মহাকালের দরবারে এদের বিচারের দাবী একদিন তোলা রইলো। অথচ, সংস্কারের অন্ধতায় লোকে এ কথাটা কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না।

কিন্তু এ-সব আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত কথা। আর না। তবে এ সম্বন্ধে আর একটা কথা বোধ হয় বলা ভালো। তোমরা হয়তো তখন ছোট, অধুনালুপ্ত একখানা মাসিক পত্রে তখন রবীন্দ্রনাথকে এবং তাঁর ভক্তশিষ্য বলে আমাকেও মাসের পর মাস আক্রমণ চলছে, গালি-গালাজ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অবধি নেই—তার ভাষাও যেমন নিষ্ঠুর, অধ্যবসায়ও তেমনি দুর্দাম। কিন্তু কবি নীরব। আমি উত্ত্যক্ত হয়ে একদিন অভিযোগ করায় শান্তকণ্ঠে বলেছিলেন—উপায় কি! যে অস্ত্র নিয়ে ওরা লড়াই করে, সে অস্ত্র স্পর্শ করাও যে আমার চলে না। আর একদিন এমনিই কি একটা কথার উত্তরে বলেছিলেন—যাকে সুখ্যাতি করতে পারিনে, তার নিন্দে করতেও আমার লজ্জা বোধ হয়।

তাঁর কাছে অনেক কিছু শিখেছি—কিন্তু সব চেয়ে বড় এ দুটি আর ভুলিনি। আজ জীবনের পঞ্চান্ন বছর পার করে দিয়ে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি যে আমি ঠকিনি। বরঞ্চ নিজের অজ্ঞাতসারে লাভের অঙ্কে অনেক জমা পড়েছে। মানুষের শ্রদ্ধা পেয়েছি, ভালবাসা পেয়েছি। বস্তুতঃ এই ত কালচার,—নইলে এর কি আর কোন মানে আছে? ভাষার দখল

আমার যেটুকু আছে—হয়তো একটু আছেও—তাকে কি শেষকালে এই দুর্গতির মধ্যে টেনে নামাব?

এবার তোমার সাহিত্যের সম্বন্ধে বড় প্রশ্নটার উত্তর দিই।

তুমি সসঙ্কোচে প্রশ্ন করেছো, "অনেকে বলচেন আপনি 'শেষ প্রশ্নে' বিশেষ একটা মতবাদ প্রচার করবার চেষ্টা করেছেন,—একি সত্যি?"

সত্যি কিনা আমি বলবো না। কিন্তু 'প্রচার করলে, প্রচার করলে—দুয়ো দুয়ো' বলে রব তুলে দিলেই যারা লজ্জায় অধোবদন হয়, এবং না না বলে তারস্বরে প্রতিবাদ করতে থাকে আমি তাদের দলে নই। অথচ, উলটে যদি আমিই জিজ্ঞাসা করি এতে অতবড় অপরাধটা হলো কিসে, আমার বিশ্বাস বাদী-প্রতিবাদী কেউ তার সুনিশ্চিত জবাব দিতে পারবে না। তখন একপক্ষ বে-বুঝের মতো ঘাড় বেঁকিয়ে কেবলই বলতে থাকবে—ও হয় না—ও হয় না। ওতে art for art's sake নীতি জাহান্নমে যায়। আর অপর পক্ষের অবস্থাটা হবে আমাদের হরির মত।

গল্পটা বলি। আমার এক দূর সম্পর্কের ভগ্নীর বছর-চারেকের একটি ছেলের নাম হরি,—সাক্ষাৎ শয়তান। মারধর গালিগালাজ, একপায়ে কোণে দাঁড় করিয়ে দেওয়া—কোন উপায়েই তার মা তাকে শাসন করতে পারলে না। বাড়িসুদ্ধ লোকে যখন একপ্রকার হার মেনেছে, তখন ফন্দিটা হঠাৎ কে যে আবিষ্কার করলে জানিনে, কিন্তু হরিবাবু একেবারে শায়েস্তা হয়ে গেল। শুধু বলতে হোতো এবার পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোক ডেকে এনে ওকে অপমান করো। অপমানের ধারণা তার কি ছিল সেই জানে,কিন্তু ভয়ে যেন শীর্ণকায় হয়ে উঠতো।এদেরও দেখি তাই। একবার বললে হোলো—প্রচার করেছে। Art for art's sake হয়নি। কিন্তু কি প্রচার করেচি, কোথায় করেচি, কি তার দোষ, কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল—এ সব প্রশ্নই অবৈধ। তখন কেউবা দিতে লাগলো গালাগালি, কেউবা জোড় হাতে ভগবানের আরাধনায় লেগে গেল—"রূপকার যদি সংস্কারক হয়ে ওঠেন,তবে হে

ভগবান ইত্যাদি ইত্যাদি”। ওরা বোধ হয় ভাবেন অনুপ্রাসটাই যুক্তি এবং গালিগালাজটাই সমালোচনা। তাঁদের এ কথা বলা চলবে না যে, জগতের যা’ চিরস্মরণীয় কাব্য ও সাহিত্য, তাতেও কোন না কোন রূপে এ বস্তু আছে। রামায়ণে আছে, মহাভারতে আছে, কালিদাসের কাব্যগ্রন্থে আছে,আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণীতে আছে, ইবসেন-মেটারলিঙ্ক-টলস্টয়ে আছে, হামসুন-বোয়ার-ওয়েলসে আছে। কিন্তু তাতে কি? পশ্চিম থেকে বুলি আমদানি হয়েছে যে art for art’s sake—এ সব যেন ওদের নখাগ্রে! গল্পের গল্পত্বই মাটি, কারণ চিত্ত-রঞ্জন হোলো না যে! কার চিত্ত-রঞ্জন? না আমার! গাঁয়ের মধ্যে প্রধান কে? না, আমি আর মামা।

তুমি ‘চিত্ত-রঞ্জন’ কথাটা নিয়ে অনেক লিখেচো কিন্তু এটা একবার ভেবে দেখোনি যে ওটা দু’ টো শব্দ। শুধু ‘রঞ্জন’ নয়, ‘চিত্ত’ বলেও একটা বস্তু রয়েছে! ও পদার্থটা বদলায়। চিৎপুরের দপ্তরীখানায় ‘গোলেবকাওলির’ স্থান আছে। ও অঞ্চলে চিত্ত-রঞ্জনের দাবী সে রাখে, কিন্তু সেই দাবীর জোরে বার্‌নার্ড শ’কে গাল দেবার তার অধিকার জন্মায় না।স্বীকার করি যে, বুলি আওড়ানোর মোহ আছে, ব্যবহারে আনন্দ আছে, পণ্ডিতের মতো দেখতেও হয়, কিন্তু উপলব্ধি করার জন্যে দুঃখ স্বীকার করতে হয়। অমুক for অমুক sake বললেই সকল কথার তত্ত্ব নিরূপণ করা হয় না।

নানা কারণে ‘পথের দাবী’ রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি। সে কথা জানিয়েও চিঠির শেষের দিকে লিখেছিলেন,“এ বই প্রবন্ধের আকারে লিখিলে মূল্য ইহার সামান্যই থাকিত, কিন্তু গল্পের মধ্যে দিয়া যাহা বলিয়াছ দেশে ও কালে ইহার ব্যাপ্তির বিরাম রহিবে না”। সুতরাং কবি যদি একে গল্পের বই মনে করে থাকেন ত এটা গল্পের-ই বই। অন্ততঃ, এটুকু সম্মান তাঁকে দিয়ো।

উপসংহারে তোমাকে একটা কথা বলি। সমাজ-সংস্কারের কোন দুরভিসন্ধি আমার নাই। তাই, বইয়ের মধ্যে আমার মানুষের দুঃখ-বেদনার বিবরণ আছে, সমস্যাও হয়ত

আছে, কিন্তু সমাধান নেই। ও কাজ অপরের, আমি শুধু গল্প লেখক, তাছাড়া আর কিছুই নই।

একটা মিনতি। তুমি অপরিচিতা, বয়সে হয়তো অনেক ছোট। আমি সরল মনে তোমার নানা প্রশ্নের দুই-একটার জবাব যথাশক্তি দিতে চেয়েছি। তবু, অনিচ্ছা সত্ত্বেও দু'-একস্থানে কঠিন যদি কিছু লিখে থাকি রাগ কোরো না।

('সুমন্দ ভবনে'র শ্রীমতী...সেনকে লিখিত পত্র। বিজলী, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা হইতে গৃহীত।)

রবীন্দ্রনাথ

কবির জীবনের সপ্ততি বৎসর বয়স পূর্ণ হোলো। বিধাতার এই আশীর্বাদ শুধু আমাদিগকে নয়, সমস্ত মানবজাতিকে ধন্য করেছে। সৌভাগ্যের এই স্মৃতিকে আনন্দোৎসবে মধুর ও উজ্জ্বল করে আমরা উত্তরকালের জন্য রেখে যেতে চাই এবং সেই সঙ্গে নিজেদেরও এই পরিচয়টুকু তাদের দিয়ে যাবো যে, কবির শুধু কাব্যই নয়, তাঁকে আমারা চোখে দেখেচি, তাঁর কথা কানে শুনেচি, তাঁর আসনের চারিধারে ঘিরে বসবার ভাগ্য আমাদের ঘটেচে। মনে হয়, সেদিন আমাদের উদ্দেশেও তারা নমস্কার জানাবে।

সেই অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ—আজকের এই সাহিত্য-সভা। সাহিত্যের সম্মিলন আরও অনেক বসবে, আয়োজন-প্রয়োজনে তাদের গৌরবও কম হ'বে না, কিন্তু আজকের দিনের অসামান্যতা তারা পাবে না। এ ত সচরাচরের নয়, এ বিশেষ এক দিনের, তাই এর শ্রেণী স্বতন্ত্র।

সাহিত্যের আসরে সভা-নায়কের কাজ আরও করবার ডাক ইতিপূর্বে আমার এসেছে, আহ্বান উপেক্ষা করতে পারিনি, নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করেও সসঙ্কোচে কর্তব্য সমাপন করে এসেচি, কিন্তু এই সভায় শুধু সঙ্কোচ নয়, আজ লজ্জা বোধ করচি। আমি নিঃসংশয় যে, এ গৌরব আমার প্রাপ্য নয়, এ ভার বহনে আমি অক্ষম। এ আমার প্রচলিত বিনয়বাক্য নয়, এ আমার অকপট সত্য কথা।

তথাপি আমন্ত্রণ অস্বীকার করিনি। কেন যে করিনি আমি সেইটুকুই শুধু ব্যক্ত করব।

আমি জানি বিতর্কের স্থান এ নয়, সাহিত্যের ভালো-মন্দ বিচার, এর জাতিকুল নির্ণয়ের সমস্যা নিয়ে এ পরিষৎ আহূত হয়নি,—তার প্রয়োজন যথাস্থানে—আমরা সমবেত হয়েছি বৃদ্ধ কবিকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করে দিতে। তাঁকে সহজভাবে বলতে—কবি, তুমি অনেক দিয়েছো, এই দীর্ঘকালে তোমার কাছে আমরা অনেক পেয়েছি। সুন্দর, সবল,

সর্বসিদ্ধি-দায়িনী ভাষা দিয়েছো তুমি, তুমি দিয়েছো বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ কাব্য, দিয়েছো অনুরূপ সাহিত্য, দিয়েছো জগতের কাছে বাংলার ভাষা ও ভাবসম্পদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, আর দিয়েছো যা সকলের বড়—আমাদের মনকে তুমি দিয়েছো বড় করে। তোমার সৃষ্টির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার আমার সাধ্যাতীত—এ আমার ধর্মবিরুদ্ধ। প্রজ্ঞাবান যাঁরা যথাকালে তাঁরা এর আলোচনা করবেন, কিন্তু তোমার কাছে আমি নিজে কি পেয়েছি সেই কথাটাই ছোট করে জানাবো বলেই এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম।

ভাষার কারুকার্য আমার নাই। ওতে যে পরিমাণ বিদ্যা এবং শিক্ষার প্রয়োজন, সে আমি পাইনি, তাই মনের ভাব প্রচলিত সহজ কথায় বলাই আমার অভ্যাস—এবং এমনি করেই বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু দুর্গ্রহ এসে বিঘ্ন ঘটালে। একে আমি বিখ্যাত কুঁড়ে, তাতে বায়ু-পিত্ত-কফ আদি আয়ুর্বেদোক্ত চরের দল একযোগে কুপিত হয়ে আমাকে শয্যাশায়ী করে দিলে। এমন ভরসা ছিল না যে, নড়তে পারবো। কিন্তু একটা বিপদ এই যে, চিরকাল দেখে আসচি আমার অসুখের কথা কেউ বিশ্বাস করে না, যেন ও আমার হতে নেই। কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পেলাম সবাই ঘাড় নেড়ে স্মিতহাস্যে বলচেন, উনি আসবেন না ত? এ আমরা জানতাম। সেই বাক্যবাণের ভয়েই আমি কোনমতে এসে উপস্থিত হয়েছি। এখন দেখচি ভালই করেছি। এই না-আসতে পারার দুঃখ আমার আমরণ ঘুচত না। কিন্তু, যা লিখে আনবার ইচ্ছে ছিল, সে হয়ে ওঠেনি। একটা কারণ পূর্বেই উল্লেখ করেচি, তার চেয়েও বড় কৈফিয়ত আছে। মানুষের অল্পস্বল্প পাওয়ার কথাই মনে থাকে, তাই লিখতে গিয়ে দেখলাম কবির কাছে থেকে পাওয়ার হিসেব দিতে যাওয়া বৃথা। দফাওয়ারি ফর্দ মেলে না।

ছেলেবেলার কথা মনে আছে। পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরে ডোঙা ঠেলে, নৌকো বেয়ে দিন কাটে। বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাগরেদি করি, তার আনন্দ ও আরাম যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন গামছা-কাঁধে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বার হই, ঠিক বিশ্বকবির কাব্যের নিরুদ্দেশযাত্রা নয়, একটু আলাদা। সেটা শেষ হলে আবার একদিন ক্ষতবিক্ষত পায়ে, নির্জীব দেহে ঘরে ফিরে আসি। আদর অভ্যর্থনার পালা শেষ হলে, আভিভাবকেরা

পুনরায় বিদ্যালয়ে চালান করে দেন। সেখানে আর একদফা সম্বর্ধনা লাভের পর, আবার বোধোদয়-পদ্যপাঠে মনোনিবেশ করি, আবার একদিন প্রতিজ্ঞা ভুলি, আবার দুষ্টা-সরস্বতী কাঁধে চাপে, আবার সাগরেদি শুরু করি, আবার নিরুদ্দেশযাত্রা—আবার ফিরে আসা, আবার তেমনি আদর আপ্যায়ন সম্বর্ধনার ঘটা। এমনি বোধোদয়, পদ্যপাঠ ও বাঙ্গালা জীবনের এক অধ্যায় শেষ হল। এলাম শহরে। একমাত্র বোধোদয়ের নজিরে গুরুজনেরা ভর্তি করেছিলেন ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে। তার পাঠ্য—সীতার বনবাস, চারুপাঠ, সদ্ভাবশতক ও মস্ত মোটা ব্যাকরণ। এ শুধু পড়ে যাওয়া নয়, মাসিক সাপ্তাহিকে সমালোচনা লেখা নয়, এ পণ্ডিতের কাছে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে প্রতিদিন পরীক্ষা দেওয়া। সুতরাং সসঙ্কোচে বলা চলে যে সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটলো চোখের জলে। তারপর বহু দুঃখে আর একদিন সে মিয়াদও কাটলো। তখন ধারণাও ছিল না যে, মানুষকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোন উদ্দেশ্য আছে।

যে পরিবারে আমি মানুষ, সেখানে কাব্য উপন্যাস দুর্নীতির নামান্তর, সঙ্গীত অস্পৃশ্য। সেখানে সবাই চায় পাস করতে এবং উকীল হতে। এরি মাঝখানে আমার দিন কেটে চলে। কিন্তু হঠাৎ একদিন এর মাঝেও বিপর্যয় ঘটলো। আমার এক আত্মীয় তখন বিদেশে, তিনি এলেন বাড়ি। তাঁর ছিল সঙ্গীতে অনুরাগ, কাব্যে আসক্তি; বাড়ির মেয়েদের জড় করে তিনি একদিন পড়ে শোনালেন রবীন্দ্রনাথের ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’। কে কতটা বুঝলে জানিনে কিন্তু যিনি পড়ছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার চোখেও জল এলো। কিন্তু পাছে দুর্বলতা প্রকাশ পায়, এই লজ্জায় তাড়াতাড়ি বাহিরে চলে এলাম। কিন্তু কাব্যের সঙ্গে দ্বিতীয়বার পরিচয় ঘটলো এবং বেশ মনে পড়ে এইবারে পেলাম তার প্রথম সত্য পরিচয়। এরপরে এ বাড়ির উকিল হবার কঠোর নিয়ম-সংযম আর ধাতে সইলো না, আবার ফিরতে হলো আমাদের সেই পুরোনো পল্লী-ভবনে। কিন্তু এবার বোধোদয় নয়, বাবার ভাঙ্গা দেরাজ থেকে খুঁজে বের করলাম ‘হরিদাসের গুপ্তকথা’। আর বেরোলো ‘ভবানী পাঠক’। গুরুজনদের দোষ দিতে পারিনে, স্কুলের পাঠ্য ত নয়, ওগুলো বদ্-ছেলের অ-পাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই কোরে নিতে হোলো আমার বাড়ির গোয়াল ঘরে। সেখানে আমি পড়ি, তারা শোনে। এখন আর পড়িনে, লিখি। সেগুলো কারা পড়ে জানিনে। এক

ইস্কুলে বেশী দিন পড়লে বিদ্যে হয় না, মাস্টারমশাই স্নেহবশে এই ইঙ্গিতটুকু দিলেন। অতএব আবার ফিরতে হোলো শহরে। বলা ভাল, এর পরে আর ইস্কুল বদলাবার প্রয়োজন হয়নি। এইবার খবর পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাস-সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে, তখন ভাবতেও পারতাম না। পড়ে পড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল। বোধ হয় এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি যে নয়। লেখার দিক দিয়ে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু চেষ্টার দিক দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।

তারপরে এলো 'বঙ্গদর্শনে'র নবপর্যায়ের যুগ। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্চে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়লো। সে দিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোন দিন ভুলবো না। কোন কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে চায়, এর পূর্বে কখন স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম। অনেক পড়লেই যে তবে অনেক পাওয়া যায়, এ কথা সত্য নয়। ওই ত খানকয়েক পাতা, তার মধ্য দিয়ে যিনি এতবড় সম্পদ সেদিন আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?

এর পরেই সাহিত্যের সঙ্গে হলো আমার ছাড়াছাড়ি। ভুলেই গেলাম যে জীবনে একটা ছত্রও কোনও দিন লিখেছি; দীর্ঘকাল কাটলো প্রবাসে,—ইতিমধ্যে কবিকে কেন্দ্র করে কি করে যে নবীন বাঙ্গালা সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভরে উঠলো আমিই তার কোনও খবর জানিনে। কবির সঙ্গে কোনও দিন ঘনিষ্ঠ হবারও সৌভাগ্য ঘটেনি, তাঁর কাছে বসে সাহিত্যের শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পাইনি, আমি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন। এইটা হলো বাইরের সত্য, কিন্তু, অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল কবির খান-কয়েক বই—কাব্য ও কথা-সাহিত্য এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ঐ ক'খানা বই-ই বার বার করে পড়েছি,—কি তার ছন্দ, ক'টা তার

অক্ষর, কাকে বলে art, কি তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথাও কোনও ত্রুটি ঘটেছে কিনা—এ-সব বড় কথা কখনো চিন্তাও করিনি—ও-সব ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হতেই পারে না। কি কাব্যে, কি কথা-সাহিত্যে আমার ছিল এই পুঁজি।

একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্য-সেবার ডাক এলো, তখন যৌবনের দাবী শেষ করে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ—শেখবার বয়স পার হয়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সব থেকে বিচ্ছিন্ন, সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিলাম—ভয়ের কথা মনেই হলো না। আর কোথাও না হোক, সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাখ্যা করতে আমি পারিনে, কিন্তু ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ওর অন্তরের সন্ধান আমাকে দিয়েছে। পণ্ডিতের তত্ত্ববিচারে তাতে ভুল যদি থাকে ত থাক, কিন্তু আমার কাছে সেই সত্য হয়ে আছে।

জানি রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় এ-সকল অবান্তর, হয়তো বা অর্থহীন, কিন্তু গোড়াতেই আমি বলেছি যে, আলোচনার জন্য আমি আসিনি, এর সহস্র ধারায় প্রবাহিত সৌন্দর্য, মাধুর্যের বিবরণ দেওয়াও আমার সাধ্যাতীত, আমি এসেছিলাম শুধু আমার ব্যক্তিগত গোটা-কয়েক কথা এই জয়ন্তী-উৎসবসভায় নিবেদন করে দিতে।

কাব্য, সাহিত্য ও কবি রবীন্দ্রনাথকে আমি যেভাবে লাভ করেছি, তা জানালাম। মানুষ-রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আমি সামান্যই এসেছি। কবির কাছে একদিন গিয়েছিলাম বাঙ্গালা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা প্রবর্তিত করার প্রস্তাব নিয়ে। নানা কারণে কবি স্বীকার করতে পারেন নি, তার একটা হেতু দিয়েছিলেন যে, যার প্রশংসা করতে তিনি অপারক, তার নিন্দে করতেও তিনি তেমনি অক্ষম। আরও বলেছিলেন যে, তোমরা যদি

এ কাজ কর, কখনো ভুলো না যে, অক্ষমতা ও অপরাধ একবস্তু নয়। ভাবি, সাহিত্য-বিচারে এই সত্যটা যদি সবাই মনে রাখতো!

কিন্তু, এই সভার অনেকখানি সময় নষ্ট করেছি, আর না। অযোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতি নির্বাচন করার এটা দণ্ড। এ আপনাদের সইতেই হবে। সে যাই হোক, রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে এ সমাদর ও সম্মান আমার আশার অতীত। তাই সকৃতজ্ঞচিত্তে আপনাদিগকে নমস্কার জানাই।

(১৩৩৮ সালে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উপলক্ষে পঠিত।)